ঋতুপর্ণ

ও

কয়েকটি গল্প

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী কিরণ বালা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত

উপন্যাস :

রমলা (তৃতীয় সংস্করণ)

জীবনায়ন

ছোটগল্প :

মায়াপুরী (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

সোনার হরিণ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

রক্তকমল

কল্পলতা

ছেলে[illegible] বই :

অজয় কুমার

সোনার কাঠি
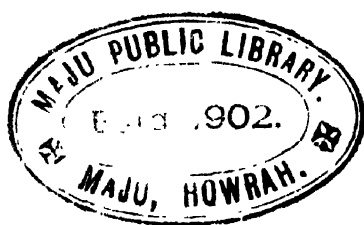
ঋতুপর্ণ

অন্ধকার ধীরে তরল হইয়া আসিল—তাহার সম্মুখে এক বৃহৎ ধূসর পটভূমিকা, পটভূমিকার উপর আলোকের রেখাপাতে অপরূপ চিত্রের ন্যায় দিব্য দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল।

গগনচুম্বী মহান্ পর্ব্বতশ্রেণী, কৃষ্ণপ্রস্তরময় ... তর উপরিভাগে নিবিড় অরণ্য, মধ্যে গুহার পর গুহার ..., নিম্নে স্বচ্ছ-তোয়া খরস্রোতা নদী। নদীর নাম হিরণ্বতী। তাহার একদিকে বিচিত্র শৃঙ্গশোভিত পর্ব্বত, অপরদিকে তরঙ্গায়িত প্রান্তরে কয়েকটি গ্রাম।

গুহাগুলি বিচিত্র সুন্দর, কোনটি সূর্য্য-বাতায়নসমন্বিত, কোনটি কারুকার্য্যময় প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীশোভিত, বৌদ্ধবিহা... বৌদ্ধ-চৈত্য।

গুহাগুলির শেষে হিরণ্বতী নদী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া বাঁকিয়া গভীর খাতে প্রবেশ করিয়াছে, যেন কোষমুক্ত তরবারিকে কে নিকষপর্ব্বতে বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। খাতের উপর পর্ব্বতশৃঙ্গ কাটিয়া সমতল করিয়া শিব-মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। সে এক অলৌকিক ব্যাপার! পর্ব্বতগাত্র হইতে এক বিরাট প্রস্তর খণ্ড

কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, দৈর্ঘ্যে দেড়শত গজ, প্রস্থে এক শত গজ ও উচ্চতায় ষাট গজ হইবে। সেই প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া, ক্ষোদিত করিয়া মহান্ শিবমন্দির গঠিত হইতেছে। অগণিত স্থপতি, ভাস্কর, শ্রমজীবি নিজ নিজ কার্য্যে রত। দ্বাদশ শত শিল্পী তিন বৎসর ধরিয়া এ মন্দির-নির্ম্মাণে নিযুক্ত, মন্দির শেষ করিতে আরও দ্বাদশ বৎসর লাগিবে। সেই দ্বাদশ শত শিল্পিগণের সঙ্গে সে-ও রহিয়াছে; ভারতের কোন গৌরবময় প্রাচীন যুগে, কোন মহান্ অপূর্ব্ব শিবমন্দির-নির্ম্মাণে সে-ও ভাস্কর ছিল।

মন্দির-সম্মুখে দ্বিতল মণ্ডপ বিপুলকায় সিংহ, হস্তী, মূর্ত্তিগুলির উপর সুরক্ষিত; অশোকমঞ্জরী উৎকীর্ণ অধিরোহণীর উপর সে বসিয়া আছে। সকলেই কর্ম্মে মগ্ন, সে কিন্তু স্তব্ধ বসিয়া উদাস-ভাবে কি ভাবি[illegible]! মণ্ডপের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে হরিদ্রাভ প্রস্তরের উপর ভগীরথের গঙ্গাবতরণ-দৃশ্য ক্ষোদিত করিবার ভার তাহার উপর। দৃশ্যটি সে কি ভাবে উৎকীর্ণ করিবে তাহাই পরিকল্পনা করিতেছে, পুণ্যসলিলা গঙ্গার সে কি রূপ দিবে?

অদূরে [illegible], সুবিশেশ্ব, পূর্ণদত্ত, তাহার নানা বন্ধু ভাস্করগণ শিবের জীবনের নানা দৃশ্য ক্ষোদিত করিতেছে। কেহ আঁকিতেছে মহাদেবের মদন-দহনের চিত্র,—নগরাজ হিমালয় বসন্তসমাগমে বিচিত্র পুষ্পশোভিত, পলাশ-পিয়াল-অশোক-তরু-মঞ্জরীর বর্ণোচ্ছ্বাসে, ক্রৌঞ্চ-চক্রবাক্-পক্ষিকুলের কূজনে চতুর্দ্দিকে বসন্ত-লক্ষ্মীর লীলা-উৎসব, তাহারি মধ্যে কৃষ্ণসার-চর্ম্মপরিহিত

ভুজঙ্গমবেষ্টিত জটাজুটধারী মহাদেব দেবদারু-তরুতলে ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর ধ্যানে আসীন ছিলেন : কন্দর্পের শরাঘাতে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হইল, ক্রোধে ললাটস্থিত তৃতীয় চক্ষু জ্বলিয়া অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে, মীনকেতু বজ্রাঘাতে অশোকতরুর ন্যায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

কেহ আঁকিতেছে,—কৈলাস পর্ব্বতে হরপার্ব্বতী বিহার করিতেছেন ; চারিদিকে কিন্নর অপ্সরোগণ, হংস দাত্যূহ শতপত্র নানা বিচিত্রাঙ্গ পক্ষী সুমধুর গান করিতেছে। বলগর্ব্বিত রাবণ কৈলাসপর্ব্বত তুলিতে যাইয়া তাহার নীচে চাপা পড়িয়াছে।

এ সকল মামুলী দৃশ্য খোদাই করিতে তাহার ভাল লাগে না। সে আঁকিতে চায় মানব জীবনের সুখদুঃখের ছ[illegible] সে বলিতে চায় মানব অন্তরের বেদনা, আশা, স্বপ্নের [illegible]। নবপরিণীতা বালিকাবধূ পিতৃগৃহ হইতে চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া স্বামিগৃহে চলিয়াছে, তাহার হৃদয়ে আজন্মপরিচিত মাতৃস্নেহপূর্ণ গৃহত্যাগের বেদনা, স্বপ্নভরা স্বামিগৃহে গমনের অজানা আনন্দ, অজানা পথ প্রান্তর নদী পার হইয়া তাহার চতুর্দ্দোলা চলিয়াছে ; তরুণ পুত্রকে মাতা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ করিতেছে, [illegible]প্রিয়বিচ্ছেদ কাতরা প্রেমিকা বর্ষার সন্ধ্যায় উদাসীন ; এমন কত দৃশ্য,— কমললোচনা সুকেশিনী ঊর্ম্মিলা পদ্মবনতীরে পুষ্পিত কদম্বতরুতলে লক্ষ্মণবিরহকাতরা ক্ষীণনিতম্বিনী ; বিদর্ভরাজদুহিতা পদ্মনিভেক্ষণা নলবিচ্ছেদবিধুরা দময়ন্তী ব্যাঘ্রভল্লুকসঙ্কুল গহন অরণ্যে একাকিনী পথহারা।

তাহার মন মানববেদনার কোন গভীর রহস্যালোকে চলিয়া গিয়াছে। সহসা সে কাহার আহ্বানে চমকিয়া চাহিল,—ঋতুপর্ণ!

তাহার নাম ঋতুপর্ণ!

ঋতুপর্ণ দেখিল, সম্মুখে স্থপতিশেখর রুদ্রদাস দাঁড়াইয়া আছেন। নৃপতি নরসিংহের এ শিবমন্দির তাঁহার পরিকল্পনা, তাঁহার তত্ত্বাবধানে এ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। ত্রসিত হইয়া দাঁড়াইয়া ঋতুপর্ণ স্থপতিশেখরকে প্রণাম করিল।

রুদ্রদাস মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ঋতুপর্ণ, আজ তোমার অন্তর বড় উদাস দেখ্ছি। ঋতুপর্ণ লজ্জিত-ভাবে উত্তর দিল আচার্য্যদেব, আমার মন সত্যই আজ চঞ্চল, গঙ্গাবতরণের দৃশ্য কিরূপে ক্ষোদিত করব, আমি ঠিক পরিকল্পনা ক'রতে পারছিনা।

স্থপতিশেখর বল্লেন, বিষয়টি কঠিন, তা'ছাড়া তুমি চির-প্রথামতে আঁকতে চাও না, নবদৃষ্টিতে অপূর্ব্বভাবে গঙ্গার রূপ দেখতে চাও। খুবই প্রশংসনীয়। আমি কোন বাধা দিতে চাই না। তবে তোমার পরিকল্পিত দৃশ্যের একটি রেখাচিত্র আগে আমায় দেখিও, তারপর পাথরে ক্ষোদিত করো। দেখ, এ স্থান পাথর কাটার শব্দে পূর্ণ, মনন করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তুমি বরঞ্চ নদীতীরে বা পাহাড়ের মাথায় কোন ঝর্ণার ধারে গিয়ে বিষয়টি চিন্তা করো। যতক্ষণ না তোমার দৃষ্টির সম্মুখে চিত্রটি পরিপূর্ণভাবে রেখা-ছন্দোবদ্ধ হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, ততক্ষণ তুমি কিছু আঁকতে বা ক্ষোদাই করতে চেষ্টা করো না। এ কথা জেনো, রূপ-ধ্যানে দিব্যদৃষ্টিতে সমগ্র চিত্রকে

আগে দেখা দরকার, তারপর তুমি পটে বা পাথরে যা আঁকবে তা হবে দিব্যদর্শনের ছায়া মাত্র।

ঋতুপর্ণ বিনীত-ভাবে বলিল, আমি সেই দিব্য নদী দেখবারই প্রয়াস করছি।

রুদ্রদাস ধীরে বলিলেন, দেবতাগণের লোচনানন্দদায়িনী সুরধুনীকে মানবনেত্রে দেখা অসম্ভব, তবে আরাধনা করলে তিনি ধ্যানে দেখা দিতে পারেন। তাঁর মূর্ত্তি কোন মানবশিল্পী ধারণা বা অঙ্কিত করতে পারে না। তুমি আমাদের শাস্ত্র-বর্ণিত দৃশ্যটি কল্পনা করো—সুরতরঙ্গিনী ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকে পতিত হয়ে জটার ভিতর দিয়ে ভূমণ্ডলে নেমে এসেছেন; মহেশ্বর নীলকণ্ঠ ভিন্ন এ গগনমণ্ডল [illegible] মন্দাকিনীর দুর্দ্ধার্বণীয় বেগ ধারণ করতে কে সমর্থ হবে? [illegible]লোকপূজ্যা গঙ্গার সম্মুখে ভগীরথ করযোড়ে পথ দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে। ছবিটি কি চোখের সামনে ফুটে উঠেছে?

রুদ্রদাসের পদধূলি লইয়া ঋতুপর্ণ বলিল, আপনার আশীর্ব্বাদে কালই একটি রেখাচিত্র দেখাতে পারব।

স্থপতিশেখর চলিয়া গেলেন। ঋতুপর্ণও [illegible]প্রাঙ্গন পার হইয়া, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নদীর দিকে চলিল।

চন্দন বর্ণা-হিরণ্বতী, বর্ষার গৈরিক সলিলস্রোতে দুকূল ভরা; তীরে শুভ্র কাশ-বন, ঘন সবুজ বেণুবন সদ্য প্রস্ফুটিত কুটজ-পুষ্প-

রাশিতে পাণ্ডুবর্ণ, যেন কোন সীমন্তিনী কেশে কর্ণিকার মালা জড়াইয়া, নিতম্বে কেতকীর কাঞ্চীদামে শোভিত হইয়া, হিরণ্য অঞ্চল ঝলমল করিয়া চকিত-চরণে চলিয়াছে।

কাঠের সেতুর কাণায় জল উঠিয়াছে। ঋতুপর্ণ ধীরে সেতু পার হইল। গ্রামে তাহার গৃহের দিকে গেল না। গ্রামের এক বিজন পথ দিয়া চলিল। আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লীলা, চতুর্দ্দিকে হিল্লোলিত শারদ-শ্রী।

সহসা বৃষ্টি আসিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ভাদ্রের বর্ষাধারায় ভিজিয়া ভিজিয়া চলে। সম্মুখে এক বৃহৎ সল্লকী বৃক্ষ দেখিয়া তাহার নীচে দাঁড়াইল। রেশমের উত্তরীয়ে ভাল করিয়া দেহ জড়াইয়া বারি বর্ষণ দেখিতে লাগিল।

পথের অপরদিকে এক স্থলপদ্মের গাছ, শ্বেতপদ্মগুলি রক্তাভ হইয়া আসিতেছে; তাহার পাশে পুঞ্জিত সপ্তপর্ণ বৃক্ষ।

ঋতুপর্ণ চমকিত হইয়া চাহিল,—স্থলকমলকুঞ্জের পার্শ্বে এক যুবতী দাঁড়াইয়া, কোন গিরিপল্লীবালা হইবে, হিরণ্বতীতে স্নান করিয়া আলিম্পনা আঁকা মাটির কলসী নদীর জলে ভরিয়া গৃহে চলিয়াছে। লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দিব্যস্বপ্নের মত। দীপ্তজিহ্ব ভুজঙ্গমগণের ন্যায় কৃষ্ণ কেশদাম জলসিঞ্চিত অঞ্চলে এলায়িত, হরিচন্দনবর্ণের গাত্রবস্ত্র, সু-ভ্রূ-তলে কমল-নয়ন কখনও স্নেহে স্নিগ্ধ কখনও উৎকণ্ঠায় চঞ্চল; চন্দ্রাননা চারু-নিতম্বিনী, স্বর্ণবলয়-মণ্ডিত দক্ষিণ হস্তে চিত্রিত জলপূর্ণ কুম্ভ ধরিয়া, পীনোন্নত-পয়োধরা, শঙ্খবলয়-শোভিত বামহস্তে নবীন ধান্যমঞ্জরী; শুভ্র কুন্দের মত

বারিবিন্দু কুন্তলে কর্ণে ঝলমল করিতেছে; অলক্তক-রাগরঞ্জিত চরণ রক্তকমলের মত; জলধারা তাহাকে ঘেরিয়া মুক্তার মালার ন্যায় ঝরিতেছে।

নবোদ্গত কদম্বপুষ্পের মত ঋতুপর্ণের চিত্ত [illegible] উঠিল।

শরতের বারিধারা থামিল। ঋতুপর্ণ সবিস্ময়ে দেখিল, নিমেষের মধ্যে সে অপরূপা যুবতী মূর্ত্তি অন্তর্হিতা। ঋতুপর্ণ পথের চারিদিক দেখিল, স্থলকমলকুঞ্জ খুঁজিল, কোথাও সে যুবতীকে খুঁজিয়া পাইল না। এ কি তাহার দৃষ্টিভ্রম? অথবা কোন দেবী ছলনা করিতে আসিলেন?

দেবীমূর্ত্তির দর্শন আর পাইল না বটে, কি[illegible] তাহার অন্তর এক অনাস্বাদিত গভীর-আনন্দে পূর্ণ হইয়া গে[illegible] চিত্তের বিষণ্ণতা আর রহিল না। আকাশ, বাতাস, আলোক, পৃথিবী, নদীধারা, পর্ব্বতমালা, চারিদিক্ আনন্দপূর্ণ মধুময়!

ঋতুপর্ণ নদীতীরে এক বনে প্রবেশ করিল। মধূক, মন্দা[illegible] দেবদারু নানাজাতীয় বৃক্ষ চারিদিকে। কোথাও ময়ূরী নাচিতেছে, কোথাও হরিণশাবক খেলা করিতেছে। বনের মধ্যে এক হ্রদ শালবনবেষ্টিত—হংস সারস, চকোর নানা পক্ষীর কলরবে পূর্ণ।

নির্জ্জন এক স্থানে কালো এক পাথরের উপর ঋতুপর্ণ স্থির হইয়া বসিল। হ্রদের জলে নীলাকাশের শুভ্রমেঘের সবুজ বনের ছায়া। ... বনস্থলী। গঙ্গাবতরণ-দৃশ্যটি কিরূপে ক্ষোদিত করিবে ... সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। কোন পরিকল্পনা করিতে ... না। সপ্তপর্ণ বৃক্ষতলে বারিধারাবেষ্টিত লাবণ্যময়ী নারীমূর্ত্তি বার বার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল।

ভাবিতে ভাবিতে সে সহসা চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

যে গঙ্গার পরিকল্পনা করিতে এত মনন করিতেছে, তাঁহারি দিব্যমূর্ত্তি ত সে স্থলপদ্মকুঞ্জের ধারে দেখিয়াছে! এই সত্যকার গঙ্গামূর্ত্তি—কল্যাণী ...রী, স্নেহময়ী মাতা, অপরূপা সুন্দরী! ব্রহ্মার কমণ্ডলু নয়, শি... জটা নয়, দিগন্তমেখলা জ্যোতির্ম্ময়ী সুরতরঙ্গিণী নয়, সুখদুঃখময় মানবগৃহের প্রেমময়ী নারীর রূপ, মাতৃরূপিনী গঙ্গা। আবার সে হতাশ-ভাবে পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। কিন্তু স্থপতিশেখর কি এ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিতে আদেশ দেবেন? এ যে মানবীর রূপ! এই ত পুণ্যসলিলা নদী, তৃষ্ণা... জল ক্ষুধার ... যোগাইয়াছে, দেশকে শস্যশামল সুন্দর সমৃদ্ধিশালা করিয়াছে, তাহার এক হস্তে জলপূর্ণ কুম্ভ অপর হস্তে ধান্যমঞ্জরী।

ঋতুপর্ণ যখন গৃহে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দেখিল

গৃহাঙ্গনে বন্ধুজীব-বৃক্ষের নীচে রক্তপ্রস্তরবেদিকায় চিত্রসেন তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

চিত্রসেন উজ্জয়িনীবাসী এক যুবক চিত্রকর, চিত্র[illegible]ক্ষা দর্শন-পাঠে তাহার অধিক অনুরাগ। সে বৌ[illegible]পাঠ করিবার জন্য এস্থানে এক বৌদ্ধ বিহারে বাস করিতে[illegible]জীবনে তাহার কোথায় একটি গভীর দুঃখ আছে, সে জন্য সে সংসার ত্যাগ করিয়া আত্মার শান্তির আশায় ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়াছে। এখন সে মনস্থ করিয়াছে, সে বৌদ্ধ ভিক্ষু হইবে; কিন্তু তাহার গুরু ভিক্ষু উদয়ন তাহাকে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে উৎসাহ দিতেছেন না। তিনি বলেন, তাহার বয়স তরুণ, এখনও ভিক্ষুজীবন-যাপনের উপযুক্ত মন হয় নাই। তিনি তাহাকে গুহা-বিহারের প্রস্তরগাত্রে বুদ্ধদেবের জীবন চিত্রিত করিতে বলিয়াছেন; সে চিত্রকর, ভগবান বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা অঙ্কিত করিয়াই সে যথার্থ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

চিত্রসেন বলিল, ওহে ঋতুপর্ণ, তোমাকে আমি সারাদিন খুঁজছি। মন্দিরে পেলুম না, নদীতীরে তোমার সেই প্রিয় স্থানেও পেলুম না, অপরাহ্ন হতে তোমার গৃহে বসে আছি। তোমার মুখ বড় মলিন দেখাচ্ছে, শারীরিক কুশল ত?

—হাঁ, শরীর আমার ভালই আছে; কিন্তু আজ আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত, সে জন্য কাজে মন লাগল না; তা'ছাড়া স্থপতি-শেখর যা খোদাই করতে বলেছেন, সে দৃশ্যটি আমার ঠিক

মনোমত নয়। নীরবে একটু চিন্তা করবার জন্যে রামগিরির হ্রদে গেছলুম।

—আশ্চর্য্য! আমার চিত্তও আজ বড় চঞ্চল, আমারও ছবি আঁকবার মোটেই মন লাগল না, সে জন্যে তোমার সন্ধানে বেরুলুম। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে নিয়ে অপরাহ্নে নদীতীরে একটু বেড়াব; তোমার সঙ্গে একটি বিষয় গভীরভাবে আলোচনা করতে চাই।

—তুমি ভাই একটু অপেক্ষা কর, আমি হাত মুখ ধুয়ে সান্ধ্য-পূজা শেষ করে নি।

—বেশ, আমিও সন্ধ্যার আরাধনা, ভগবান বুদ্ধের নাম করি।

সন্ধ্যার পূজা শেষ করিয়া যখন দুই বন্ধু বন্ধুকবৃক্ষতলে বসিল, শুক্লাচতুর্দ্দশীর চন্দ্র পূর্ব্ব গগনে উঠিয়াছে, মধুক-পুষ্প-গন্ধ লইয়া বাতাস ধীরে বহিতেছে। গৃহকোণে একটি মৃৎ-প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছে।

চিত্রসেন বলিল, ওহে ঋতুপর্ণ, ঘরে খাবার কিছু আছে কি? আহারটা সমাধা করেই আমাদের আলোচনায় বসলে ভাল হয়।

—কেন, তোমার কি ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে? আমার ঘরে ত খাবার কিছু নেই, পাচকটি আবার অসুস্থ, আজ রাতে

আর রান্না হচ্ছে না, তবে গুড়ের পায়েস, দধি ও মধু থাকতে পারে। আর আমি ত ভেবেছি, আজ রাত উপবাসে কাটাব, তাতে মন কিছু স্থির হবে ও চিন্ত[illegible]ও বাড়বে

—সে আমি জানি, তোমার ঘরে কিছু থাকে না। [illegible] চিন্তার কারণ নেই, আমিও বিশেষ ক্ষুধিত নই, তবে একেবারে উপবাসী থাকা উচিত নয়। আমি আসবার সময়ে কিছু ফল নিয়ে এসেছি, এই পর্ণপুটে আছে, তুমি তোমার পায়েস, দধিও মধু বা'র করো।

—এ যে অনেক ফল, অসময়ে এ স্থানে এ সব ফল কোথা থেকে পেলে?

—প্রাংশু আজ প্রভাতে উজ্জয়িনী থেকে এসেছে, সে এসব ফল নিয়ে এল, আঙুরগুলি বেশ রসাল। দেখ, তোমার পাথর ক্ষোদাই কাজে মানসিক পরিশ্রমের চেয়ে দৈহিক পরিশ্রম বড় কম হয় না, অনাহারে থাকা তোমার উচিত নয়।

আহার শেষে দুই বন্ধু বাহিরে বেদিকায় আসিয়া বসিল। চিত্রসেন বলিল, ওহে, ভুলেই গেছলুম, এই একটি মূল্যবান্ পুঁথি, তোমার চন্দনকাঠের পেটিকাতে সযত্নে রেখে দাও।

—কি পুঁথি?

—আমাদের কবি কালিদাস 'মেঘদূত' বলে একটি কাব্য লিখেছেন, সেই কাব্যেরই কিয়দংশ—

—কে কালিদাস?

—আমাদের উজ্জয়িনীর কালিদাসের নাম তুমি শোন নি? এখন ত তাঁকেই আমরা অবন্তীর শ্রেষ্ঠ কবি বলি—

—[illegible], মনে পড়েছে, "শকুন্তলা" নামে তাঁর এক নাট্য দেখে [illegible] ছলুম [illegible] লোকটি লেখেন ভাল, উপমাগুলি চমৎকার।

—[illegible] এ কাব্য, পুঁথিটা সযত্নে রেখো; আমার আবার এ সব জিনিষ বিহারে রাখবার জো নেই। ভিক্ষু উদয়ন একেই ত বলেন, আমার মন এখন সংসারাসক্ত; তারপর এইসব কবিদের বিরহ-কাব্য পড়তে দেখলে বলবেন, আমার হৃদয়ে রমণী-প্রেমের প্রতি কামনা, নারীসৌন্দর্য্যের প্রতি লালসা রয়েছে, ভিক্ষু হবার চিন্তা করা আমার পক্ষে দুরাশা।

—তা, তোমার ও কবির কাব্যপাঠ ধর্ম্মসাধনার খুব অনুকূল বলতে পারি না। আমারও মনে হয়, কালিদাসের লেখা প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত নয়, বড় আধুনিক ভাব ঘেঁসা, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিশ্চয় পছন্দ করেন না।

—সে আর বলতে, সভাপণ্ডিতেরা ত কবির বিরুদ্ধে এক দল তৈরী করেছেন; তাঁরা বলেন, কালিদাসের কাব্য পড়ে উজ্জয়িনীর সকল যুবক যুবতীর অন্তরে কাম-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে, এতে নৈতিক অবনতি হবে। বিদ্যার্থীদের আর শাস্ত্র-পাঠে মন নেই।

—এ বিষয়ে আমি পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত।

—বল কি! আমার কিন্তু কাব্যটা পাঠ করবার ইচ্ছা হচ্ছে;

এই চন্দ্রালোকিত শারদ রাত্রি অবশ্য বর্ষা-বিরহ-কাব্য-পাঠের পক্ষে ঠিক সময় নয়—

—তা'ছাড়া, আমাদের মন এখন চঞ্চল, চিত্ত [illegible] য়; অনুকূল মন না হলে কবির কাব্যপাঠ করা উচি[illegible] [illegible] তাতে রসগ্রহণের ব্যাঘাত ঘটে, কবির প্রতি অবিচার করা [illegible]

—ঠিক বলেছ, আচ্ছা, তুমি পুঁথিটি পেটিকাতে রেখে এস!

—আচ্ছা, তুমি যে আমার পেটিকার চারধারে ছবি এঁকে দেবে বল্লে, তার কি হল?

—ছবিটি আমি কল্পনা করেছি। আচ্ছা, খঞ্জনপক্ষী তোমার ভাল লাগে, ধরো একদল নৃত্যরত খঞ্জন-পক্ষী—

—কিন্তু শাস্ত্র-পুঁথি রক্ষা করবার পেটিকাতে পাখীর নৃত্যের দৃশ্য—

—দেখ, তুমি যাই বল আমি কোন দেবীর মূর্ত্তি আর আঁকতে পারব না, ফুল-লতা-পাখী এই সব দিয়ে তোমার একটি সুন্দর চিত্র এঁকে দেব। চৈত্যের দেওয়ালে সারা ক্ষণ কেবল বুদ্ধ-বুদ্ধ বুদ্ধ এঁকে আমি শ্রান্ত, ধ্যানী বুদ্ধ, তপস্যারত বুদ্ধ, মারের সহিত সংগ্রামকারী বুদ্ধ, ধর্ম্মপ্রচারক বুদ্ধ, কেবল সংঘাত, সংগ্রাম, সন্ধান—বুদ্ধমূর্ত্তি এঁকে এঁকে আমি ক্লান্ত!

—আজ তোমার মন কেবলমাত্র বিক্ষিপ্ত নয়, বিদ্রোহী দেখছি।

—ঠিক বলেছ, আমার অন্তরে একটা বিদ্রোহ ঘনিয়ে আসছে, সেই জন্যেই তোমার কাছে এলুম। সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার মধ্যে দেখি, পরমা শান্তি আছে,

তুমি যেন জীবন্ত-সমস্যার একটি শান্তসুন্দর সমাধান করেছ—সে জন্যই এ বিদ্রোহী চিত্ত নিয়ে তোমার কাছে এলুম।

[illegible] জনকে নিজ জীবনের সমস্যা নিজে মীমাংসা করতে হবে। [illegible] এ বিষয়ে বন্ধু সাহায্য করতে পারে, কিন্তু সমাধান করতে [illegible]। নিজ জীবনের বেদনা অশ্রু দিয়ে জীবন-প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

—ঠিক বলেছ। কিন্তু প্রশ্নটা তোমার সঙ্গে আলোচনা করলে, আমি হয়ত পথ খুঁজে পাব।

ঋতুপর্ণ "মেঘদূত" পুঁথিটি রাখিয়া আসিলে, চিত্রসেন বলিল, আমি স্থির করছি, ছবি আঁকা ছেড়ে দেব, এই চিত্রকলার চর্চ্চা ধর্ম্মজীবন-লাভের পরিপন্থী। তোমার কি মনে হয়?

—আমি প্রথমেই বলেছি, নিজ-জীবনের প্রশ্নের উত্তর জীবনের দুঃখসাধনা তপস্যার দ্বারা দিতে হবে। তবে তোমার সমস্যা সম্বন্ধে আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাই, ছবি এঁকে তুমি কি আনন্দ পাও?

—ছবি আঁকতে আমার আনন্দ, আমি বসে বসে কত কি কল্পনা করি; কিন্তু বর্ত্তমান চৈত্যে যে ছবি আঁকছি তাতে আনন্দ নেই।

—আশ্চর্য্য, এই দ্বন্দ্ব আমার মধ্যেও জেগেছে। আর দেবদেবীর মূর্ত্তি করতে ভাল লাগে না, আমি চাই মানবজীবনের হাস্যদীপ্ত অশ্রুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যদৃশ্যগুলি পাথরে ফোটাতে—

—আমারও তাই ইচ্ছা করে। আমার আঁকতে ইচ্ছে করে,

শৈশবের রূপকথা,—রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে চলেছে রাজকন্যার সন্ধানে, গভীর বন, অন্ধকার রাত তারায় ঝিম্ ঝিম্ করছে, মহুয়াবনের মাথায় চাঁদ উঠেছে; অথবা যৌবনের [illegible] স্বপ্ন —শিপ্রানদীতে যুবক-যুবতীর স্নানলীলা, বারিষিক্ত সূর্য্যালোক-দীপ্ত তনুতে আনন্দের ঝলক, বেঁচে থাকার সহজ [illegible]...এমন কি ছোট ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, এক ছোট মেয়ে মাথায় শাকের ঝুড়ি নিয়ে হাটে চলেছে, এক জ্ঞানবৃদ্ধ নদীর ধারে ছিপ নিয়ে বসে আছে—এম্নি সব দৃশ্য আঁকতে ইচ্ছে করে।

—বেশ, তাই আঁক। বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরে ছবি নাই আঁকলে, উজ্জয়িনী, দ্বারাবতী, বিদিশা, বারাণসী যেখানেই যাবে, শ্রেষ্ঠিরা তাদের নৃত্যপ্রাসাদ সুচিত্রিত করবার জন্যে বহু অর্থ দিয়ে তোমায় নিযুক্ত করবে, তুমি আজ সুপরিচিত।

—কিন্তু প্রশ্ন তা' নয়, চিত্রকলার বিষয়-বস্তু নিয়ে আমার সমস্যা নয়; আমি জানতে চাই, আমার এই চিত্রকলার চর্চ্চা আমার ধর্ম্মলাভের পক্ষে অন্তরায় নয় কি, এ পথে কি আমি মোক্ষ পাব?

—দেখ, ভগবান বুদ্ধ মোক্ষলাভের যে পথ নির্দ্দেশ করেছেন সে সাধনপ্রণালী আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে পথ আমি বুঝি না, এ বিষয়ে কোন মত দিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে বাতুলতা হবে; তবে আমি নিজ-জীবনে অনুভব করেছি, আমার ভাস্কর-জীবন আমার আত্মাকে বিকশিত, উন্নত করে তুলেছে।

—কিন্তু নির্ব্বাণ-লাভ এ পথে হবে কি?

ঋতুপর্ণ বলিল, নির্ব্বাণ কাকে বলো, আমি জানি না। সৃষ্টিক... হিরণ্যগর্ভ আমার বোধের অগম্য, আমার বুদ্ধির ধ... আমি দেখছি, অরূপ আপনাকে প্রকাশিত করে চলেছেন ন... নব রূপ-ধারায়। এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের রূপ-মাধুরীতে আমি... ইচ্ছা করলেই এ মোহ দূর করতে পারব কি না, জানি না। আমার শিব আজ মেতেছেন সৃষ্টির আনন্দে, তাঁর ললিত নৃত্যের ছন্দে প্রলয়-পয়োধিজল থেকে পৃথিবী উঠে এল, সে ছন্দে অনন্ত গগনে সূর্য্য-চন্দ্র-তারা ঘূর্ণিত হচ্ছে, সপ্তসমুদ্রে বারিরাশি আলোড়িত হচ্ছে, সাগর-মেখলা সুন্দরী ধরণীতে, তৃণে, বৃক্ষে, শত সহস্র জীবপর্য্যায়ে প্রাণ বিকশিত, হিল্লোলিত, রূপ হতে রূপান্তরিত; চারিদিকে কি অপূর্ব্ব প্রাণোচ্ছ্বাস, কত সুন্দর রূপ, কত বিচিত্র ভঙ্গী! চেয়ে দেখ, নীলস্ফটিকসম গগন-তলে চন্দ্রমা, অরণ্যময় পর্ব্বতক্রোড়ে নদীজলরেখা, তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্রে সবুজের প্রশান্তি, কিংশুক-কর্ণিকা-বৃক্ষের পুষ্পস্তবকে বর্ণোৎসব, আর এই প্রকৃতির মধ্যে কি সুন্দর নরনারীদেহ! এ রূপ-মাধুরীতে বিমুগ্ধ হয়ে সৃষ্টির প্রকাশের বেদনা অন্তরে অনুভব করেছ কি? তা যদি না ক'রে থাকো, তা'হলে চিত্রকলা চর্চ্চা করো না। আজ বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির লীলায় মাততে হবে। তারপর যেদিন তিনি তাণ্ডব নৃত্যে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করবেন, সেদিন আবার তাঁহার মধ্যে বিলীন হয়ে যাব।

চিত্রসেন নির্ব্বাক্ হইয়া জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ঋতুপর্ণ ধীরে বলিতে লাগিল, আমার

মনের অশান্তির কারণটা তোমাকে বলি। কাল মধ্য-রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল, ত্রয়োদশীর চাঁদ তখন পর্ব্বত শিখরে। মনে হল, আমায় কে ডাকছে! ওই সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের নীচে এসে ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, কোথাও কেউ নেই। তারপর মনে হল, হিরণ্বতী নদীতে বন্যা এসেছে মৃদুগুরু ধ্বনি আসে। নগ্নপদেই গৃহ হতে বাহির হলুম। তখন অনুভব করলুম, শিবমন্দিরের বৃহৎ শিলা আমাকে আহ্বান করছে। মন্ত্রচালিতের মত নদী পার হয়ে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। মণ্ডপের সম্মুখে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়ালুম—চারিদিক স্তব্ধ, জ্যোৎস্নালোকে রহস্যময়। মনে হল, বিরাট্ শিলার মধ্যে কে যেন কাঁদছে, কোন নারী কাঁদছে। চমকিত বিমূঢ় ভাবে শুনতে লাগলুম, সে নারী কাঁদছে, বল্ছে—আমাকে মুক্ত করো, আমাকে প্রকাশিত করো। সমস্ত প্রস্তর ভরে তার প্রকাশবেদনা আলোড়িত হয়ে উঠছে। সে বলছে—তোমরা আপন খুসিমত একি সব মূর্ত্তি ক্ষোদাই করছ, আমি যে বন্দিনী রইলুম, আমাকে প্রকাশিত হতে দাও! তোমরা স্রষ্টা নও, তোমরা যন্ত্র মাত্র, বরফ গলে যেমন নদী প্রবাহিত হয়, কুঁড়ি হতে যেমন পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সমুদ্রমন্থনে যেমন লক্ষ্মী উঠে আসে, তেমনি আমি পাথর থেকে বিকশিত হয়ে উঠব, তোমরা পথরুদ্ধ করো না, আমায় সাহায্য করো।

হায়, আমি এ নারীকে কেমন করে মুক্ত করব? ওই পাথরের মধ্যে সে ঘুমিয়ে কাঁদছে, কেমন করে তাকে জাগাব, অর্গল খুলে

দ্বারমুক্ত করে দেবো, সে পৃথিবীতে স্বপ্রকাশিতা হবে! চিত্রসেন, আমা[illegible]া বুঝতে পারছ?

[illegible]ত্রি পর্যন্ত দুই বন্ধুতে আলোচনা চলিল।

মধ্যরাত্রিতে ঋতুপর্ণ আবার গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইল। মন্দির শিলা তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, লৌহকে যেমন চুম্বক আকর্ষণ করে। ওই শিলামধ্যে কোন্ লাবণ্যময়ী নারী ক্রন্দন করিতেছে, তাহাকে মুক্তি দিতে হইবে।

ঋতুপর্ণ দিশাহারা হইয়া চলিল। পাথর ক্ষোদিত করিবার শিল্প-সরঞ্জাম দুই হস্তে। দূরে গিরি বনভূমি স্তব্ধ; ঝিল্লীরবে পাণ্ডুবর্ণ আকাশ রিমঝিম করিতেছে, জ্যোৎস্নাধৌত নদীজলরাশি দুই তীরে মত্ত আবেগে আছড়াইয়া পড়িতেছে। গুহাগুলি সুষুপ্ত।

মন্দির-মণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া সে স্থির দাঁড়াইয়া রহিল না। গঙ্গাবতরণের জন্য যে প্রস্তরখণ্ড নির্দিষ্ট ছিল, সে প্রস্তর লৌহ ছেদনী দিয়া কাটিতে লাগিল। ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে নয়, শিবের জটায় নয়, হিমালয়ের তুষারস্রোতে নয়, ওই কৃষ্ণশিলার মধ্যে গঙ্গা বন্দিনী, তাঁহার কারাগারের অর্গল-দ্বার খুলিতে হইবে। উন্মত্তের মত ঋতুপর্ণ প্রস্তর ক্ষোদিত করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে শুধু যন্ত্রী, গঙ্গামূর্ত্তি আপনা

হইতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, আজ দ্বিপ্রহরে সপ্তপর্ণ বৃক্ষতলে ধারাবর্ষণে সে যে লাবণ্যময়ী যুবতী দেখিয়াছে, তাহারি [illegible]ত মূর্ত্তি!

কমলনয়নী, পীনোন্নত-পয়োধরা, চারুনিতম্বিনী। [illegible] হস্তে মঙ্গলজলপূর্ণ কলস, অপর হস্তে স্বর্ণবর্ণা ধান্যমঞ্জ[illegible]। ছয় ঋতুর পুষ্পে দেহ বিভূষিতা,—কেশে হেমন্তের কুন্দ, [illegible] নিদাঘের শিরীষপুষ্প, কণ্ঠে বসন্তের নবকুরবক-মাল্য, কটিতে শীতের লোধ্র-পুষ্পের কাঞ্চী, সীমন্তে বর্ষার নবকদম্ব, চরণে শরতের রক্ত শ্বেত পদ্মরাজি।

মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিতে ঋতুপর্ণ নিমগ্ন। কখন চন্দ্র অস্ত গেল, শুকতারা নিভিয়া গেল, সে জানিতে পারিল না। ঊষার রাঙা আলো যখন তাহার নবোৎকীর্ণ গঙ্গা-মূর্ত্তির উপর আসিয়া পড়িল, তখন সে চরণতলে পদ্মের পর পদ্ম ফুটাইতেছে।

কাহার গম্ভীর আহ্বানে সে যেন জাগিয়া চমকিয়া উঠিল।

—ঋতুপর্ণ!

সম্মুখে স্থপতিশেখর রুদ্রদাস একা দাঁড়াইয়া। চারিদিকে অরুণের তীব্র আলোক।

রুদ্রদাস ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, ঋতুপর্ণ, তুমি কি করছ! ভোর বেলা ঘুম ভেঙে মনে হল, যেন ছেদনীর শব্দ শুনছি। একি কাণ্ড! সারাদিন অলস-ভাবে কাটালে, আর রাতে তস্করের মত এসে পবিত্র মন্দিরগাত্রে বিলাসিনী নারীমূর্ত্তি—

সহসা স্থপতিশেখর স্তব্ধ হইলেন, অপূর্ব্ব গঙ্গামূর্ত্তির দিকে বিমুগ্ধ ভাবে [illegible] রহিলেন।

ঋতুপর্ণ ন[illegible]জানু হইয়া তখন রুদ্রদাসের পায়ের উপর পড়িয়া কাতর কণ্ঠে [illegible]চ্ছে, আচার্য্যদেব, আমি উন্মাদ; রাত্রে কি অসহনীয় [illegible]য় উন্মত্ত হয়ে আমি এখানে এসে এই মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করেছি—সৃষ্টির প্রকাশের বেদনা—ওই শিলার মধ্যে এই নারী কাঁদছিল—আমাকে যে শাস্তি হয় দিন—আমি হয়ত উন্মাদ—

স্থপতিশেখর কিন্তু ঋতুপর্ণের কোন কথাই শুনিতেছিলেন না, আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, একি অমৃতনিষ্যন্দিনী দেবী-মূর্ত্তি! মা গঙ্গা, তোমার একি রূপ দেখলুম! ঋতুপর্ণ, এ রূপ তুমি কোথায় দেখলে, তুমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছ!

—গুরু, আমার শাস্তির বিধান করুন, তা না হলে আমি মনে শান্তি পাব না।

—আয়, আমার বক্ষে আয়, তোর মত শিষ্য পেয়ে আমি গর্ব্বিত।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে।

—ঋতুপর্ণ, এ দেবীমূর্ত্তি গড়ে ভারতের শিল্পেতিহাসের তুমি নবযুগ আনলে। আমিও এ মূর্ত্তি পরিকল্পনা করতে পারতুম না। দেবীকে তুমি প্রেমে স্নেহে মানবী, মানবীকে তুমি সৌন্দর্য্যে মহিমায় দেবী করেছ! তবে, এ মূর্ত্তি রাজ-পুরোহিতের পছন্দ হবে না, আপত্তি হবে।

—আচায্যদেব! আমাকে পরিহাস করবেন না—আমার কি প্রায়শ্চিত্ত, কি শাস্তি?

—তোমাকে কঠিন শাস্তিই দেব।

—বলুন, আমি অন্তরে শান্তি পাই।

—বলভীপুরে যে মন্দির নির্ম্মাণ করবার ক... হচ্ছে, সে মন্দিরনির্ম্মাণের সমস্ত ভার তোমার উপর, তুমি হবে সে মন্দিরগঠনের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ স্থপতি!

—এ কি পরিহাস!

—পরিহাস নয়, বৎস, সত্য। যাও, বলভীপুরে মন্দির নির্ম্মাণ কর, তা'হলে তুমিও বুঝতে পারবে, আমার অন্তরে কত স্বপ্ন, কত কল্পনা জাগে, প্রকাশের কত ব্যথা, কিন্তু চারিদিকে বাধার জন্য মনের মত করে সৃষ্টি করতে পারি না!

—সৃষ্টির, প্রকাশের বেদনা—শিলার মধ্যে কোন নারী বসে কাঁদছে—আচায্যদেব, আমি—

জয়ন্তের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গভীর রাত্র পর্য্যন্ত ষ্টুডিওতে কাজ করিতে করিতে সে ইজি-চেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার নাম ঋতুপর্ণ নয়। বিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় সে ভাস্কর জয়ন্ত।

জাগিয়া ইজি-চেয়ার হইতে সে উঠিল। জানালার কাঁচে ভোরে[illegible]র আলো। ষ্টুডিওর চারিদিকে মাটির তাল, প্ল্যাস্টার [illegible] প্যারিস, অর্দ্ধক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি, নানা জিনিষ ছড়ান[illegible]

তাহার [illegible] হইল, এখনি বুঝি স্থপতিশেখর রুদ্রদাস তাহার সম্মুখে আসিয়া বলেন, বলভীপুরে মন্দিরনির্ম্মাণের ভার তোমার ওপর।

হায়, এ যুগে কেহ মন্দিরনির্ম্মাণ করে না!

বিংশ শতাব্দীর জীবনকে মূর্ত্তি দিতে হইবে। মানবের স্বপ্ন, বেদনা, সংগ্রাম, আনন্দ।

ষ্টুডিওর জানালা, দ্বার সে খুলিয়া দিল। প্রভাতের আলো ষ্টুডিওর চারিদিক দীপ্ত করিয়া তুলিল।

ভেরনল

উত্তর-ভারতের নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে নৈনিতালে এসেছি। নভেম্বরের শেষে নৈনিতাল প্রায় জনহীন। আমাদের হোটেলের দোতালায় আমি আর একজন বাঙ্গালী প্রৌঢ় ডাক্তার, দু'জন আছি। হোটেলটি পাহাড়ের মাথায় বনের ধারে, নীচে নীল হ্রদ পাহাড়-ঘেরা, কখনো মরকতমণির মত ঝকমক করে, কখনো গলিত পোখরাজের মত। রৌদ্রতপ্ত সুনির্ম্মল দিন, জ্যোৎস্নাময় সুশীতল পাণ্ডুর রাত্রি, চারিদিকে অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা।

সমস্ত দিন হ্রদটি চিত্রিত দর্পণের মত স্থির ছিল, রঙীন বাংলোর সারি, সবুজ বন, নীলাকাশ, মেঘের স্তূপ, তার ওপর নানা রূপ ও বর্ণের প্রতিবিম্ব। সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিমাকাশে মেঘপুঞ্জে রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি, দিগ্বধূরা হোলিখেলায় মেতে উঠল, হ্রদ সুবর্ণবর্ণ। তারপর পাইন-বনের পিছনে চাঁদ উঠল, পাহাড়ের তলায় ঘন অন্ধকারময় হ্রদ রহস্যময়ী নারীর কালো চোখের মত।

ডিনার খেয়ে যখন ঘরের সামনে কাচ-ঘেরা বারান্দায়

বসলুম, বিষ্টি পড়ছে, চারিদিক সজল অন্ধকার, দেবদারু-বন আন্দো[illegible]ত কঁরে ঝোড়ো বাতাস উঠছে ক্ষুব্ধ ক্রন্দনের [illegible] মত

বারান্দায় [illegible] াকা গেল না, ঝড়ের জন্য নয়, দাঁতে অসহ্য বেদনা অনু[illegible] করলুম। বাঁ মাড়ির শেষে একটু ব্যথা দু'দিন ধরে রয়েছে, সহসা মাঝ রাত্রে ঝড়ের মধ্যে ব্যথা অসহ্য মনে হল, দাঁতের স্নায়ুগুলি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! ঘরে ঢুকে দেখলুম, এ্যাস্‌পিরিন্‌ বা বেদনা-নাশক কোন ওষুধ সঙ্গে নেই। রাত বারোটা হবে, বাহিরে ঝড় উঠেছে। ওষুধের জন্য কোথায় যাওয়া যায়?

মনে পড়ল, আমার ঘরের পরে দুটি খালি ঘর, তার পরের-টাতে প্রৌঢ় ডাক্তার সরকার আছেন। তাঁর কাছে নিশ্চয় কোন ওষুধ পাওয়া যাবে। ডাক্তারের সঙ্গে একদিন সামান্য আলাপ হয়েছিল। অদ্ভুত মানুষ মনে হয়। তিনি সমস্ত পৃথিবী দু'বার পরিভ্রমণ করেছেন। কোনদিন দেখি, বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারে স্তব্ধ বসে আকাশে মেঘের লীলা হ্রদে রঙের খেলা দেখছেন, কোনদিন দেখি মোটা চাবুক হাতে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছেন ভীমতালের দিকে। ছ'ফুট লম্বা দীর্ঘ দেহ, সুঠাম, দৃঢ়, বৃদ্ধ শালগাছের মত, সব সময়ে ছাই রংএর একটা সুট পরে, চোখে কালো কাচের চশমা, রেখাঙ্কিত মুখে আরক্তিম ভাব, নাকেরডগায় লাল ছাপ কাঁচকড়ার ফ্রেমের নীচে টকটক্‌ করে।

দাঁতের যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠল। ডাক্তারের ঘরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

করিডরের এক কোণে একটি আলো মৃদু জ্বলছে। ডাক্তারের ঘরের দরজার ওপর তিনটে চোখ পড়লুম,—ডাক্তার সরকার!

ভেতর হতে উত্তর হল,—আঁত্রে! (দরজা খুলে আসুন)

দরজা ভেজান ছিল, একটু ঠেলতে খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করে দেখলুম, স্প্রিং-গদিওয়ালা রেক্সিন-মোড়া লম্বা সেত্তিতে ডাক্তার সরকার অর্দ্ধশয়ানভাবে সামনের জানালার দিকে চেয়ে; জানালার কাচের ওপর বৃষ্টি-ঝড় আছড়ে পড়ছে ক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত। বাহিরে ঝঞ্ঝার আর্ত্তনাদ কিন্তু ঘরের ভেতর অদ্ভুত স্তব্ধতা।

সেত্তির পেছনটা দরজার দিকে, ডাক্তার সরকার আমার প্রবেশ দেখতে পাননি, তিনি বলে উঠলেন, আসুন হের্ রোজেনবেয়ার্গ, আপনার প্রতীক্ষা করছিলুম।

হের্ রোজেনবেয়ার্গ! এ হোটেলে কোন জার্ম্মানকে ত কখনও দেখিনি। চেঁচিয়ে বল্লুম, আমি—কিছু মনে করবেন না—দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণা—

চমকে তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, চশমার কালো কাচ ঢাকা চোখ দেখা গেল না, কুঞ্চিত কপালের ওপর কালো সাদা চুলগুলি চক্‌চক্ করতে লাগল।

ও, আপনি! কি চাই?

দেখুন, দাঁতে বড় ব্যথা, যদি আপনার কাছে কোন ওষুধ থাকে, [illegible] অ্যাসপিরিন—

ব্যথা ! [illegible] যত ব্যথা পাবেন জীবনকে তত গভীর ভাবে অনুভব [illegible]রবেন। যার যত বেদনা-বোধ সে তত উচ্চস্তরের জীব।

দেখুন, ডাক্তার যদি দার্শনিক হয়ে ওঠেন, রোগীর অবস্থা বড় সঙ্গীন হয়।

হা ! হা ! ডাক্তার-দার্শনিক ! কোথায় ব্যথা, বলুন ?

দাঁতে, এই বাঁ মাড়িতে, স্নায়ুগুলি কে ছিঁড়ে—

থাক, ব্যথার বর্ণনা করতে হবে না, আমি বুঝেছি। বসুন, বসুন, ওই সোফায়। কি লিক্যর আপনি ভালবাসেন, ক্যুমেল, বেনেডিক্‌টিন্‌—আমার এখানে কয়েক রকম আছে মাত্র।

সামনের ছোট টেবিলে নানা বর্ণ ও আকৃতির বোতল ও ছোট বড় লিক্যর-গ্লাস।

না, আমি কিছু খাই না !

খান না ? হা, হা, খেলে দাঁতের ব্যথা হত না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে দেখছি আচ্ছা, দেখি একটা ওষুধ আছে।

ডাক্তার সরকার লেখবার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি ছোট শিশি বের করলেন। শিশি হতে দুটি চ্যাপ্টা বড়ি এক মাঝারি গ্লাসে রাখলেন, তারপর একটা বড় বোতল হতে সোনালী তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে দিলেন। গ্লাসটা নেড়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, খেয়ে ফেলুন, একটু হাল্কা বোর্দো

দিলুম, ওতে ওষুধের কাজ ভালই হবে, আর আমার ঘরে জল নেই, চাকরটা সন্ধ্যা থেকে পলাতক। ওষুধের অনুপান হচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সের সূর্য্যালোকপুষ্ট র... ...রস।

ব্যথা দূর করবার জন্য তখন কেউ হাতে... দিলেও খেয়ে ফেলতে পারতুম। বড়ি-মিশ্রিত বোর্দো এক চুমুকে খেয়ে ফেল্লুম।

ডাক্তার সরকার আমার মুখোমুখি বসলেন সেত্তিতে হেলান দিয়ে। ছোট গ্লাস হতে এক চুমুক সারক্রজ খেয়ে বল্লেন, কেমন মনে হচ্ছে?

বেদনা কম মনে হচ্ছে।

ব্যস, তাহলেই হল। বেদনা হয়ত আপনার আগেকার মতই আছে, তবে ওই যে মনে হচ্ছে বেদনা নেই তাহলেই হল। আসল হচ্ছে মনে, আর মন দিয়ে যা অনুভব না করি তাই মিথ্যা। বসুন, গল্প করা যাক, এ ঝড়ের রাতে কি আর এখন ঘুম হবে!

বেশ ত, আপনি একটা গল্প বলুন, আপনার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা, কত দেশ কত রকম মানুষ দেখেছেন, তার ওপর আপনি ডাক্তার, কত রকম রোগী—

ডাক্তারের রোগী দেখা, clinical eye দিয়ে দেখা, সত্যি-কার দেখা নয়, যে দেখায় বেদনা নাই, হৃদয়ের ব্যথা নাই, আতঙ্ক নাই, সে দেখা সত্যি দেখা নয়।

কিন্তু দেখায় আনন্দও ত থাকতে পারে।

হঁা, কিন্তু সব গভীর আনন্দানুভূতির সঙ্গে তীব্র বেদনা রয়েছে। শুধু মনের ব্যথা নয়, দেহের ব্যথাকেও যত রকম ভাবে যত [illegible] নূতন করে জানতে পারবেন, জীবনকে তত গভীর ভাবে [illegible]বেন, প্রাণের মর্ম্মস্থলে গিয়ে পৌছবেন। এই দেহ মনের বেদনার অভিজ্ঞতায় আমাদের সত্তা গড়ে ওঠে, আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়।

আপনার জীবনে বহু অভিজ্ঞতা আছে মনে হয়।

হঁা, নব নব অনুভূতিলাভের তৃষ্ণা আমাকে সারা জীবন দিশাহারা করেছে। ডাক্তাররূপে আমাকে দেখতে হয়েছে মানুষের দেহ-মনের ভাঙনের রূপ, তার পরম বেদনার মূর্ত্তি। সেজন্য প্রকৃতির বা মানবসৃষ্ট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য আমি দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরেছি, দেহের সমস্ত স্নায়ু শিরা উপশিরার রক্তস্রোত দিয়ে প্রাণের গতি উল্লাস আনন্দময় অভিব্যক্তি অনুভব করতে চেয়েছি। এমনি ঝড়ের রাতে আমি সাঁতরে পদ্মাপার হয়েছি, বন্যায় নগরগ্রাম ভেসে যেতে দেখেছি, কারাকোরাম পর্ব্বতের সতের হাজার ফিট উঁচুতে তুষার-নদী পার হয়ে কাশ্মীর হতে খোটান গেছি, মোটরকারে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করেছি, উগাণ্ডার জঙ্গলে সিংহ মেরেছি। কত অপূর্ব্ব বস্তু কত অপরূপ দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে, শ্রীনগরে ডাল্ হ্রদে রঙীন সন্ধ্যা; শীতের সুইজারল্যাণ্ডে জ্যোৎস্নারাত্রে তুষার-শুভ্রতায় শ্লেজ্ চালান; লিডোতে ভূমধ্যসাগরের সমুদ্র তীরে সূর্য্যালোক পান, নিউইয়র্কের পঞ্চম

এভিনিউর জনতা, জঙ্গলবেষ্টিত এঙ্কোর-ভাট; বেলজিয়ামের যুদ্ধ টেঞ্চ; অন্ধকার রাত্রে তাজমহল; প্রয় . . কুম্ভমেলা; মিসিসিপির ঘন অরণ্য; প্রশান্ত মহাসাগরের . . রোপ্লেন। এ সব অভিজ্ঞতা আমার আত্মাকে মূর্ত্ত করেছে বটে কিন্তু আমার সত্তার বিকাশ হয়েছে মানব অন্তরের বেদনাময় অনুভূতিতে।

ডাক্তার সরকার চুপ করলেন। ঝোড়ো বাতাসে কাচের জানালা ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। অন্ধকার আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত বিদ্যুৎ চমকে গেল। ঘন নীলপর্দ্দা ঘেরা আলো কেঁপে কেঁপে উঠল।

আমি ধীরে বল্লুম, আচ্ছা আপনি হের্ রোজেনবেয়ার্গ নামে কার আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন?

ডাক্তার সরকার চমকে সোজা হয়ে বসলেন; তাঁর চশমার কাচ চক্‌চক্ করতে লাগল অন্ধকার রাত্রে কালো বাঘের চোখের মত। বোতল থেকে একটু সুরা ঢেলে পান করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর আমার দিকে চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, একটা চুরুট ধরান। গল্পটা আপনাকে তাহলে বলি—

মুনসেনে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করে আমি কিছুদিন

স্থইজারল্যাণ্ডে ডাভোসে এক যক্ষ্মা-স্যানোটোরিয়মে কাজ করি। এম্নি নভেম্বর মাসের শেষাশেষি একবার ডাভোস থেকে প্যারিসে [illegible] গারত্থলিয়ঁতে যখন নামলুম, রাত এগারটা হবে। কুলি[illegible] জিনিষ বুঝিয়ে দিচ্ছি, ওভারকোটের ওপর কে থাপ্পড় মারলে—হের্ ডক্টর!

ফিরে দেখি রিচার্ড রোজেনবের্গ, আমাদের স্যানাটোরিয়মের একটি রোগী। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে, দেখতে আমার চেয়েও লম্বা, বহুদিন রোগে ভুগে শীর্ণ শুষ্ক মুখ, চোখে একটা তীব্র ক্ষুধিত দৃষ্টি। তার বাঁ পায়ের গোড়ালির এক হাড়ে যক্ষ্মা, ছ'বছর স্যানাটোরিয়ম বাসের পর প্রায় সেরে গেছে, এখন ক্রাচের (crutch) সাহায্যে বাঁ পা তুলে খট্খট্ করে ঘুরে বেড়ায়। লোকটি জাতিতে স্থইস, তাঁর পূর্ব্বপুরুষ এসেছিলেন নরওয়ে থেকে। জুরিকের এক ধনী মহাজনের একমাত্র সন্তান।

বিস্মিত হয়ে বল্লুম, আপনি এখানে? পরশু আপনার জ্বর হয়েছিল, আপনারত স্যানাটোরিয়ম হতে বার হওয়া বারণ।

আমি পলাতক, হের্ ডক্টর। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল। আপনি কোন হোটেলে যাচ্ছেন?

ল্যাটিন কোয়ার্টারে আমার এক জানা সস্তা হোটেল আছে, সেখানে ঘর রাখতে লিখেছি।

চলুন, আপনার সঙ্গেই যাব। একা বড় হোটেলে গিয়ে থাকতে ভাল লাগবে না। ছাত্রদের থাকবার হোটেল ত?

পথে ট্যাক্সিতে রোজেনবেয়ার্গ বল্লেন, তাঁর মাথায় মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাঁর বিশ্বাস তাঁর ম[illegible]ষ্কে ক্যানসার হচ্ছে; জুরিকে এক ডাক্তার নাকি বলে[illegible] একটা টিউমার হতেও পারে। প্যারিসে বড় ডা[illegible] দেখাবার জন্য তিনি স্যানাটোরিয়ম থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিশ্বাস, একটা ক্যানসার কোথায়ও হচ্ছে।

কথাটা আমি বিশ্বাস করলুম না। আমার হোটেলে আমার ঘরের কাছেই রোজেনবেয়ার্গের জন্য ঘর ঠিক করে দিলুম। শোবার উদ্যোগ করছি, টেনের স্যুট বদলে সাজসজ্জা করে রোজেনবেয়ার্গ আমার ঘরে এসে ঢুকলেন, বল্লেন,—চলুন, একটু বেরোন যাক।

আমি বড় শ্রান্ত।

ছ'বছর পরে প্যারিসে এলুম. এরমধ্যেই শোব! Tender is the night—

আপনি ঘুরে আসুন, আমি কাপড় জামা ছেড়ে ফেলেছি।

সেন-নদীর তীরে একবার ঘুরে আসতে না পারলে রাত্রে ঘুম হবে না। আচ্ছা, বনসুই!

বিছানাতে শুয়ে শুনতে লাগলুম, হের্ রোজেনবেয়ার্গ সরু সিঁড়ির কাঠের ওপর ক্রাচের খট্ খট্ শব্দ করে দ্রুত নেমে চলেছেন, প্যারিসের পথে আনন্দ লাভের সন্ধানে।

পরদিন সকালে খবর নিয়ে জানলুম, রোজেনবেয়ার্গ অকাতরে ঘুমোচ্ছেন, রাত তিনটের সময় মত্তাবস্থায় হোটেলে ফিরেছিলেন।

এরপর সাতদিন রোজেনবেয়ার্গের সঙ্গে দেখা হয় নি।

রাত্রে পুচি[illegible] টস্কা দেখে অপেরা-প্রাসাদ হতে রাস্তায় বের হয়েছি, এ[illegible]র ওপর এক থাপ্পড় মেরে কে বল্লে—হের্ ডক্টর! পিছন ফিরে দেখি, রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গ!

হের্ ডক্টর, কেমন লাগল অপেরা?

চমৎকার।

চলুন, কাছে ইটালীয়ান রেস্তোরাঁ আমার জানা আছে, চমৎকার মোজেল মদ রাখে? ১৯১৩ সালের যুদ্ধের ঠিক আগের বছরের মোজেল মদ, না এলে আমি সত্যই দুঃখিত হব।

অপেরার সঙ্গীত লহরী শ্রবণে অন্তর তখন উল্লসিত। শালিয়াপেনের স্বরদীপ্ত মহান কণ্ঠধ্বনি কানে বাজছে। বল্লুম, চলুন আজ রাত্রে একটু হল্লা করা যাক।

রেস্তোরাঁতে কিছু খেয়ে আমরা অপেরার কাছে এক কাফেতে এসে বসলুম। পথের ফুটপাতের অর্দ্ধেক জুড়ে টেবিল চেয়ারের সারি, পাশ দিয়ে নানা সজ্জার নরনারীস্রোত অবিরাম চলেছে।

রোজেনবেয়ার্গ, প্যারিসের জীবন কেমন উপভোগ করছ?
বড় বেদনা, মাথার মধ্যে অসহ্য বেদনা হয়।

পকেট থেকে সে একটি ছোট শিশি বের করে ছোট টেবিলের ওপর রাখলে। কিছুক্ষণ পর শিশি থেকে দুটো বড়ি বার করে কফির সঙ্গে খেয়ে ফেল্লে।

দু'ঘণ্টা অন্তর এই এ্যাস্‌পিরিন খাচ্ছি; না খেলেই যন্ত্রণায় মরে যাব।

কোনও ডাক্তার দেখালে ?

দেখালুম বই কি, ডাক্তার লেভি বললেন, ...য় নয় পেটে, লিভারের কাছে টিউমার মনে হচ্ছে, ক্যানসারের পূর্ব্বলক্ষণ হতে পারে। তবে আমি জানি ক্যানসার ও ক্যানসার হবেই। ক্যানসারে আমার মা মরেছেন। ও! সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

সহসা সে থামল। দেখলুম জ্বালাময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের সুসজ্জিতা বারবিলাসিনীদের দিকে চেয়ে আছে। তিনটি রূপাজীবা চলেছে শিকারের সন্ধানে। রোজেনবেয়ার্গের চেয়ারের পাশে খাড়া করা ক্রাচ দু'টির দিকে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে তারা চলে গেল। রোজেনবেয়ার্গের শীর্ণ মুখ আরও কালো হয়ে উঠল।

বল্লুম, ডাক্তাররা ত নিশ্চিতরূপে কিছু বলছেন না?

নিশ্চিতরূপে কে কি বলতে পারে? অহর্নিশি এই যে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছি! ক্যানসার রোগীকে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মরতে আমি দেখেছি, তার সব সিম্‌টম্‌ আমি জানি। গারস্‌, আরও দু'গ্লাস। আচ্ছা আপনি ডাক্তার, ক্যানসারের কোন চিকিৎসা আছে?

এখনও পর্য্যন্ত আমাদের জানা নেই, নানা পরীক্ষা চলছে।

শুধু রোগী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মরে।

একদিন ত আমাদের প্রত্যেককে মরতে হবে।

ক্যানসারের রোগী যদি আত্মহত্যা করে, তাতে দোষ কি ?

প্রাণ আ... প্রাণকে আমরা এখনও সৃষ্টি করিতে পারিনি, স্বইচ্ছায় তাকে নাশ করার অধিকার আছে কি ?

শুধু যন্ত্রণা ভোগের অধিকার আছে। আমি আত্মহত্যা করতে পারি, আমার মা নেই বাবা দু' মাস হল মারা গেছেন, কিন্তু এক বুড়ী দিদিমা আছেন, তিনি মনে বড় আঘাত পাবেন। গারসঁ, এই নোটটা ভাঙিয়ে আন দেখি।

কাফের এক খিদমৎগার এগিয়ে আমাদের কাছে এল। রোজেনবেয়ার্গ তার বুকের পকেট থেকে এক মোটা মনি-ব্যাগ বের করলে, নানা রংএর নোটে ভরা। নোটের তাড়া থেকে একখানি একহাজার ফরাসী ফ্র্যাঙ্কের নোট বের করে গারসঁর হাতে দিলে। তারপর মনিব্যাগটা খুলেই টেবিলের ওপর রাখলে। শুধু কাফের নয়, রাস্তার লোকেও দেখতে পেলে নোটভরা মনিব্যাগ টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে।

ব্যাগটা তুলে রাখ, রিচার্ড।

হুঁ ! এব্যাগে মার্ক-ফ্র্যাঙ্ক-পাউণ্ড-ডলারে ত্রিশ হাজার ফরাসী ফ্র্যাঙ্কের বেশী আছে।

রোজেনবেয়ার্গ কথাগুলি এত উচ্চস্বরে বল্ল যে রাস্তার লোকও শুনতে পেলে। কাফের লোকেরা আমাদের টেবিলের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

আস্তে, এত চেঁচামেচি করছ কেন। ব্যাগটা পকেটে রাখ। এত টাকা পকেটে নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় এরকম ভাবে ঘোরার মানে কি?

হুঁ, মানে কি? বেশ বলেছ ডক্টর, তোমাকে ধাঁধা দেওয়া যাচ্ছে, উত্তর দাও; একটা লোক ত্রিশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক পকেটে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে প্যারিসের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেন? হা হা, জীবনটা একটা গোলকধাঁধা নয় কি, একবার প্রবেশ করলে সব সময়ে তা থেকে বের হবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

দেখ এর চেয়ে কম টাকার জন্য প্যারিসের পথে লোক খুন হয়েছে।

বা, বেশ বলেছ। শোন ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল ভালই হল, আমার যে রকম শরীরের অবস্থা, যে কোন সময়ে কিছু ঘটতে পারে, আমার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, দেখ আমি এখন লক্ষপতি, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি এক ক্যানসার রিসার্চ হাস্‌পাতালে দিয়ে যেতে চাই, আমার একটা উইল আছে, স্যানাটোরিয়মে আমার ঘরে নয়, এক জায়গায় লুকোনো আছে, সেটা তোমায় বলে যেতে চাই—

সহসা রোজেনবেয়ার্গ চুপ করে পথের দিকে চাইলে। আমাদের কাছ দিয়েই একটি যুবক ও যুবতী যাচ্ছিল, যুবকটি কদাকার ভীম প্রকৃতির দেখতে, প্যারিসের গুণ্ডাদলের মনে হয়, যুবতী কিন্তু পরমাসুন্দরী, সদ্যপ্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মত স্নিগ্ধ লীলায়িত মূর্ত্তি!

রোজেনবেয়ার্গ দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে ডাকলে,—মাদলেন! মেয়েটি হেসে এগিয়ে এল, আমাদের টেবিলে আমাদের [illegible]নের মাঝে চেয়ারে এসে বসল। যুবকটি কিন্তু কোথায় [illegible]রে পড়ল।

এ্যালো মাদলেন! কি খাবে?

চল, এক রেস্তোরাঁতে যাওয়া যাক, সন্ধ্যে থেকে খাইনি, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

মাদলেনের দুই চোখে কৌতুকময় হাসি, রোজেনবেয়ার্গ তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে। ধীরে সে বল্লে, আমরা এই খেয়ে এলুম, এই নাও, কাল সকালে খেও।

রোজেনবেয়ার্গ আবার ব্যাগ বের করে মাদলেনের হাতে একখানা পাঁচশ ফ্র্যাঙ্কের নোট দিলে। ব্যাগে নোটের তাড়া রাস্তার লোক শুদ্ধ দেখতে পেলে। মাদলেনের নয়ন দু'টি বিদ্যুৎপর্ণা।

আমি বল্লুম, অনেক রাত হয়েছে, এবার যাওয়া যাক।

আমরাও যাব, চলো মাদলেন।

ট্যাক্সিতে মেয়েটি বসল আমাদের দু'জনের মাঝখানে। আমি চুপ করে বসে রইলুম, রোজেনবেয়ার্গ অনর্গল বকে যেতে লাগল।

দেখ ডাক্তার, আজকাল রাত্রে ভেরনল না খেলে আমার ঘুম হয় না। আচ্ছা, কোন ভাল ঘুমের ওষুধ তোমার জানা আছে? তুমি দিতে চাও না, বুঝতে পারছি।

মেয়েটি হেসে বলে উঠল, আমি জানি।

আবেগের সঙ্গে রোজেনবেয়ার্গ বল্লে, কি ?

মেয়েটি উচ্চ হেসে বল্লে, সে বলব না।

তারপর সমস্ত পথ রোজেনবেয়ার্গ আমার সঙ্গে ভেরনলের গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে এল,—সে তিন থেকে চার ট্যাবলেট খায় ; ক'টা ট্যাবলেট খেলে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা, ডাভোসে কে কবে ভুলে বেশী ভেরনল খেয়ে মরেছে, ইত্যাদি।

হোটেলে ঢুকে রোজেনবেয়ার্গকে একটু আড়ালে ডেকে বল্লুম,—মেয়েটি কে ? সে অবাক হয়ে বল্লে, কে ? আমি কি ওকে জানি ? ওকে আমি চিনি না। বিস্মিত হয়ে বললুম, তা'হলে তুমি ওকে জান না ! তোমার সঙ্গে এত টাকা রয়েছে, ব্যাগটা না হয়—দেখলুম, আমাদের ট্যাক্সির পেছনে আর একটা মোটরকার আসছিল।

রোজেনবেয়ার্গের বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে অদ্ভুত হাসি খেলে গেল।

হের্ ডক্টর, এই পৃথিবীতে আমরা কে কাকে জানি ?

মেয়েটিকে নিয়ে রোজেনবেয়ার্গ তার ঘরে গেল। আমি আমার ঘরে গিয়ে কোচে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লুম ; বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, শূন্য কালো গলিতে বাতাস বইছে ক্ষ্যাপা কুকুরের অবিশ্রান্ত আর্ত্তনাদের মত ; সমস্ত হোটেল নিঝুম নিদ্রিত।

এ রাত্রে ঘুমোবার আশা নেই ! ফায়ার প্লেসের উপর

অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরাতন ঘড়িটা শূন্য ভাবে চেয়ে রইল। মোপাসাঁর একটি গল্পের বই নিয়ে পড়তে বসলুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না. জানালার সার্সির ঝন্ ঝন্ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঝড় উঠেছে, তার সঙ্গে মৃদু তুষারপাত।

বাহিরে উন্মত্তা প্রকৃতি, গর্জ্জমান অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিকিমিকি , কিন্তু হোটেল অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ।

চমকে উঠলুম, রোজেনবেয়ার্গের ঘরে কি হয়েছে কে জানে? মেয়েটি নিশ্চয় কাজ শেষ করে চলে গেছে। পাশে স্নানের ঘরে জলের কল ভাল করে বন্ধ হয়নি, জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়ছে।

মনে হল, কে যেন আমায় ডাকছে, ডক্টর, হের ডক্টর! কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে অন্ধকার করিডর পার হয়ে সে আহ্বান আসছে।

ধীরে উঠে ঘরের দরজা খুললুম, অন্ধকার করিডর, রোজেনবেয়ার্গের ঘরের দরজা একটু ফাঁক করা, সেই ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা পথের তমিস্রপুঞ্জে এসে পড়েছে। আলোর রেখা দেখে মনে সাহস হল।

চকিতপদে করিডর পার হয়ে রোজেনবেয়ার্গের ঘরে প্রবেশ করলুম। স্তব্ধ ঘর, রোজেনবেয়ার্গ বিছানাতে চাদরের ওপর স্থির হয়ে শুয়ে আছে। স্যুট ছেড়ে রাতের পোষাকও পরেনি। অতিস্থির শুয়ে, চোখে অচঞ্চল দৃষ্টি; পাশে ছোট মার্ব্বেল

টেবিলে ভেরনলের শূন্য শিশি, দুটি খালি বোতল ও খালি গেলাস। মেয়েটি কোথায়ও নেই।

ডাকলুম,—রোজেনবেয়ার্গ! রিচার্ড!

কোন সাড়া নেই। কোথায় একটা খট্‌খট্‌ শব্দ হল। কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, তুষার-শীতল। হাত ধরে নাড়ী দেখলুম, কোন স্পন্দন নেই। জামা খুলে বুকের ওপর কান চেপে শুনতে চেষ্টা করলুম, বুকের ধুকধুকানি একটু আছে কিনা। চিরদিনের মত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেছে। বাহিরে ঝোড়ো বাতাস গর্জ্জন করছে।

বুঝলুম আমার আর কিছু করবার নেই। ধীরে চোখ দু'টি বন্ধ করে গায়ের ওপর একটি চাদর ঢাকা দিয়ে দিলুম।

নিজের ঘরে পরিশ্রান্ত হয়ে সোফায় বসতে শীতের রাত্রে গায়ে ঘাম দিল।

আবার মনে হল, কে আমায় ডাকছে, ডক্টর! হের্ ডক্টর! অন্ধকার করিডর পার হয়ে কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে সে ডাক আমার সমস্ত ঘর ধোয়ার মত ভরে তুলেছে। একটা সিগারেট ধরালুম, একটা জানালা খুলে দিলুম, যদি বাহিরের ঝোড়ো বাতাসের গর্জ্জনে ঘরের এ ডাক ডুবে যায়।

আহ্বান অতি মৃদু ছিল, তীব্র উচ্চ হয়ে উঠল। শুধু আমার নাম ডাকা নয়, একটা খট্‌খট্‌ শব্দ, সিঁড়ির কাঠের ধাপের ওপর ক্রাচের খট্‌খট্‌ শব্দ। সুষুপ্ত হোটেলের স্তব্ধতা কেঁপে উঠেছে।

ক্রাচের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের সারি পার হয়ে অন্ধকার করিডর অতিক্রম করে আমার ঘরের সম্মুখে এসে থামল, ঘরের দরজার উপর তিনটে টোকা পড়ল—হের্ ডক্টর !

তখন আতঙ্কে মূর্চ্ছা যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি আতঙ্ক-রস অনুভব করতে চেষ্টা করছিলুম। রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের প্রেতাত্মা দেখতে আমি প্রস্তুত।

বল্লুম,—আঁাত্রে !

ধীরে দরজা খুলে গেল। অন্ধকার পটভূমিতে ছবির মত রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের মূর্ত্তি ফুটে উঠল, মোটা কালো ওভার-কোট পরা, মাথায় ধূসর টুপি, দুই বগলে লম্বা ক্রাচ ! মুখের ওপর ঘরের আলো পড়ে কাচের মত চকচক করচে। চোখে ক্ষুধিত তীব্র দৃষ্টি নেই, বড় শ্রান্ত ঝিমানো ভাব।

যেন বেতার-যন্ত্র হাতে কথাগুলি কানে এল। হের্ ডক্টর, আমি বাইরে যাচ্ছি, উইলের কথা বলতে এলুম, উইলটা আছে আমাদের স্যানাটোরিয়মে, ফ্রাউ মায়ারের ঘরের টেবিলের তৃতীয় ড্রয়ারে আছে। আচ্ছা, বন্‌সুই, 'অনেক দূর যেতে হবে।

মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলুম। থট্‌থট্ শব্দ দূর হতে চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণে গা শিরশির করে উঠল, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, নিজের বুকের ধুকধুকানি শুনতে পাচ্ছি। দু'ঘরের পরে রোজেনবেয়ার্গের মৃতদেহ !

সহসা করিডরে কে আলো জ্বাললে, চোখ ঝলসে উঠল। সিঁড়িতে যুবকদলের হাস্য, যুবতীদের চঞ্চল পদধ্বনি। একদল চৈনিক ছাত্রছাত্রী হাস্যে গল্পে সিঁড়ি মুখর করে উঠছে। রাত দুটোর আগে তারা সাধারণত ফেরে না।

ছাত্রের দল যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে। আমিও আমার ঘরের দরজায় চাবি দিলুম। হোটেল আবার সুপ্ত স্তব্ধ।

ঝড় থেমেছে, নিঃশব্দ শুভ্র তুষার পতন হচ্ছে, যেন কে দোলন-চাঁপা ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে চারিদিকে ছড়িয়া দিচ্ছে। খোলা জানালার কাছে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলুম প্রভাতের আলোর আশায়।

ডাক্তার সরকার চুপ করলেন। আমি নিঃশব্দে চুরুট টান্‌তে লাগলুম। বাইরে ঝড় বৃষ্টি থেমেছে, মৃদু জ্যোৎস্নায় আকাশ থম থম করছে।

ধীরে উঠে দাঁড়ালুম।

ডাক্তার সরকার বলে উঠলেন, মিষ্টার ঘোষ, আজ রাত্রেও আমার ঘুম হবে না দেখছি। এখন রাত্রে ভেরনল না খেলে আমার ঘুম হয় না।

কথাগুলি শুনে কোন অজানা ভয়ে চমকে উঠলুম। এ যেন ডাক্তার সরকারের কণ্ঠস্বর নয়।

দেখুন ত ওই খানে একটা শিশি আছে, হ্যাঁ—ওই হল্‌দে শিশিটা। আমি আর উঠতে পারছি না। পায়ে কেমন ব্যথা হয়েছে। কয়েকটা ট্যাবলেট শিশি থেকে এই গেলাসে রাখুন।

ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, কটা?

কটা? ও এই পাঁচ ছ'টা। ওতে কিছু হবে না আমার। ওর কমে ঘুম হয় না। আপনি হয়ত ছ'টা খেলে—

মন্ত্রচালিতের মত ছ'টা ট্যাবলেট গেলাসে ফেলে তার সঙ্গে একটু মদ মিশিয়ে ডাক্তার সরকারকে দিলুম। তিনি এক চুমুকে সবটা খেয়ে বল্লেন—একটু বসুন। তারপর চোখ বুজে সেত্তিতে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি চুপ করে বসে রইলুম। পা যেন নাড়তে পারছি না। ঘরে স্তব্ধতা পাথরের মত ভারী; জানালার কাচ ঝকমক করছে অবগুণ্ঠিতা নারীর ভীতিব্যাকুল দৃষ্টির মত।

কতক্ষণ বসেছিলুম জানি না। কালের স্রোত যে বয়ে চলেছে, সে অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলুম।

মনে হল, খট্‌খট্ শব্দ আসছে, কাঠের মেজের ওপর ক্রাচের খট্‌খট্ শব্দ। সে শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমার ঘরের পাশ দিয়ে বারান্দা পার হয়ে ঘরের সামনে এসে থামল, দরজার ওপর তিনটে টোকা, টক্ টক্ টক্!

ভয়ে শিউরে উঠলুম। চেঁচিয়ে উঠলুম—ডাক্তার সরকার!

কোন সাড়া নেই।

প্রাণপণে চেঁচালুম—ডাক্তার সরকার! ডাক্তার!

নিঃসাড়, স্পন্দহীন দেহ।

ডাক্তার সরকারের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলুম বরফের মত কন্‌কনে হাত, নাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল না।

নাকের কাছে হাত রাখলুম, বুকের উপর কান দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলুম, নিশ্চল হৃদ্‌পিণ্ড, দেহে রক্তচলাচল নেই।

ডাক্তার সরকার মৃত? হয়ত ভেরনলের মাত্রা আমি অধিক দিয়েছি। বিবর্ণ মুখ সাদা মুখোসের মত।

আতঙ্কে বিহ্বল দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকালুম। দরজার ওধারে রিচার্ড রোজেনবেয়ার্গের প্রেতাত্মা, আর এধারে ডাক্তার সরকারের মৃতদেহ।

কালো চশমার কাচের পেছনে চোখ দু'টো নড়ে উঠল। শিউরে উঠলুম।

ডাক্তার সরকার বলে উঠলেন, কি মিষ্টার ঘোষ! আবার দাঁতের ব্যথা হচ্ছে নাকি?

না।

তবে ভয় পেয়েছেন। না আমি মরিনি, অত সহজে মৃত্যু হয় না।

আমার মনে হচ্ছিল—

হুঁ, সে রাত্রে প্যারিসের হোটেলে কি রকম আতঙ্ক অনুভব করেছিলুম তার কিছু আভাস পেলেন বোধ হয়।

আপনি চমৎকার অভিনেতা দেখছি ।

অভিনয় করতে পারি বলেই ত এতদিন বেঁচে আছি। আচ্ছা আপনি শুতে যান, আজ রাত্রে আর রোজেনবেয়ার্গ এল না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যান। একটু খেয়ে যান, ভাল ঘুম হবে। শুনুন, গল্পের শেষটুকু আপনাকে বলা হয় নি। পরদিন সকালে কিন্তু রোজেনবেয়ার্গের মৃতদেহ হোটেলের ঘরে পাওয়া গেল না। দু'দিন পরে সেন-নদীর জলে মৃতদেহ পাওয়া গেল। লোকে বলে গুণ্ডারা রাতারাতি মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেছল। কিন্তু আমার থিওরি হচ্ছে, মাদলেন ওকে মারেনি। আপনার মনে কি হয় ?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে চলে এলুম। ঘরে এসে খোলা জানালার পাশে বসলুম। হ্রদের জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি।

ভাবতে লাগলুম, ডাক্তার সরকার কি উন্মাদ, না বানিয়ে গল্প বলতে ওস্তাদ !

রাণুর ঠাকুরমা

পাড়ার সবই তাঁকে ডাকে রাণুর ঠাকুমা বলে। সতীশ সরকারের সাত বছরের মেয়ে রাণু ও তার ঠাকুমাকে পাড়ার সবাই চেনে, ভালবাসে। বস্তুতঃ রাণুর ঠাকুমা কেবল রাণুর নন, তিনি পাড়ার ঠাকুমা।

বয়স ষাট বছরের ওপর হবে, পাতলা ছিপছিপে শরীর বেঁটে শক্ত গড়ন, বৃদ্ধা হলেও দেহে কিশোরীর কর্ম্মক্ষমতা; চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, মুখে শান্ত দিব্যভাব, চোখে করুণাময় মমতা, দেহের রং কাচা-সোনার মত, হাত দু'খানি সর্ব্বদা সংসারের মঙ্গল কর্ম্মে রত, তপঃক্লিষ্টা পুণ্যময়ী নারী।

রাণুর ঠাকুমা ছোটবেলায় বিধবা হয়েছিলেন, আপন বলতে তাঁর বিশেষ কেউ ছিল না। সতীশ সরকারের তিনি কোন দূর সম্পর্কের পিসী। সতীশবাবুর প্রথম পুত্র ক্ষিতীশের জন্মের সময় তিনি পাড়াগাঁ থেকে সহরে আসেন, তারপর বরাবর এই পরিবারেই আছেন। সে আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ক্ষিতীশ এখন এম-এ পরীক্ষা পাশ করে ল' পড়ছে ও চাকরির সন্ধান করছে এবং ক্ষিতীশের মাতা তার জন্যে উপযুক্ত বধূর সন্ধান করছেন।

ক্ষিতীশের পর সতীশবাবুর স্ত্রী সরমার আরও সাতটি পুত্র-কন্যার জন্ম হয়েছে।

এই সকল শিশুদের সকল প্রকার সেবা লালন পালনের ভার ঠাকুমার ওপর। গৃহিণী সরমা সারাক্ষণ সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। শিশুদের স্নান করান, খাওয়ান, ঘুম পাড়ান, অসুখ হলে রাত জাগা ইত্যাদি সকল কাজ ঠাকুমা করে এসেছেন। একটি শিশুকে তিনি অতি যত্নে পরিশ্রমে দু'তিন বছরে সুস্থ সবল স্বাবলম্বী করে তোলেন, অমনি আর একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশু তাঁর তত্ত্বাবধানে আসে। কিন্তু সরমার সকল পুত্রকন্যাদের মধ্যে তাঁর ষষ্ঠ কন্যা রাণু, কি করে তাঁকে বিশেষ ভাবে অধিকার করে বসল, তা ঠাকুমা নিজেও বুঝতে পারলেন না। রাণুর মধ্যে প্রাণ উচ্ছ্বসিত, গিরিঝর্ণার মত চঞ্চলা সে, তার চোখ-ভরা দুষ্টামি, মুখভরা কৌতুক, কলহাস্যে কথা বলে, সব সময়ে ছুটে চলে, সিঁড়িতে দু'ধাপ ডিঙ্গিয়ে লাফ দিয়ে নামে, দাদা দিদিদের কাছে মার খায়, মার কাছে বকুনি খায়, স্কুলে গিয়ে মারামারি করে, হাত পা কেটে ফ্রক ছিঁড়ে আসে, সেজন্য ঠাকুমার মন তার জন্য সব সময়ে উদ্বেগপূর্ণ। তার চঞ্চলতা, দুষ্টামি কলহাস্য ঠাকুমার বড় ভাল লাগে। অন্য নাতি নাতনীরা এসে বলে, ঠাকুমা, তুমি রাণুকে শুধু ভালোবাস, আমাদের মোটেই ভালবাস না। রাণু তাঁর গলা জড়িয়ে উত্তর দেয়, ঠাকুমার খুসি আমায় ভালবাসবেন, তোমরা আমায়

মায়ো কেন? ঠাকুমা ভাবেন, হয়ত তিনি রাণুকে বেশী ভাল-বাসেন। অন্তরের দুর্ব্বলতা তিনি জয় করে উঠতে পারেন না।

শুধু সরমারি ছেলেমেয়েরা নয়, পাড়ার ছেলেমেয়েরা, তাঁর নাতিনাতনীদের স্কুলের বন্ধুবান্ধবেরাও তাঁর আদরের দাবী করে, আবদারের অধিকার জানায়।

তার কারণ, রাণুর ঠাকুমা চিন্তায় আধুনিক মহিলা। বর্ত্তমান যুগের প্রগতির সঙ্গে তিনি তাল ফেলে চলতে চান। তাঁকে কেউ কখনও মালা জপতে দেখেনি; ভোরবেলা উঠে স্নান করে পূজা আহ্নিক সেরে নেন; দিনের বেলা নানা কাজে সময় কোথায়? সকালে স্ব-পাক ভাতে ভাত আহার, রাতে ফল, মিষ্টি ও দুধ তবে বিকেলে এক কাপ চা চাই। পাড়াগাঁ থেকে যখন এসেছিলেন অতি সামান্য লেখাপড়া জানতেন, এখন বাঙ্গলা বই ও পত্রিকা পড়ে বাঙ্গলা ভাষায় যতদূর শিক্ষা সম্ভব তা হয়েছে, প্রতিদিন দুপুরে বাঙ্গলা খবরের কাগজ পড়া চাই। পাড়ার মেয়েরা আসে তাঁর কাছে সেলাইর 'কাট', প্যাটর্ণ শিখতে ছেলেরা আসে দেশের রাজনীতির তর্ক করতে, তারপর ছোট নাতিনাতনীর দলও সন্ধ্যায় ঘিরে বসে গল্প শুনতে। ঠাকুমা তাদের শুধু রূপকথা বলেন না, নানা বৈজ্ঞানিক গল্প করেন, এরোপ্লেনে কে সাগর পাড়ি দিল, মোটরকারে কে কত মাইল চলেছে, পাখীরা কেমন করে নীড় রচনা করে, মৌমাছিরা কেমন করে মধু সঞ্চয় করে, এই সব নানা কথা।

ঠাকুরমার ভয়ানক অসুখ। সতীশবাবুর টানাটানির সংসার

হলেও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হচ্ছে না। পাড়ার যুবক ডাক্তার দল চিকিৎসার ভার নিয়েছে, পাড়ার মেয়েরা এসে পালা করে রাত জাগছে। রাণু ত স্কুল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে বাবার বকুনিতে যেতে হয়।

যমে মানুষে টানাটানি চলেছে দশদিন ধরে। দু'দিন হল ঠাকুমা সংজ্ঞাহীনা।

রাত গভীর, সমস্ত বাড়ী নিঝুম, পাড়া নিদ্রিত। চতুর্থীর চাঁদ কখন নারিকেল গাছের আড়ালে অস্ত গেছে। অন্ধকার আকাশে অগণিত তারা মাতৃহারা শিশুদের চাউনির মত। পূর্ব্বদিক থেকে শীতল মৃদু বাতাস বইছে, শেফালি বন হতে স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাস বারান্দায় ভেসে আসছে।

ঠাকুমা ধীরে বিছানা থেকে উঠলেন, অবাক হয়ে ঘরের চারদিকে চাইলেন। ইলেকট্রিক ল্যাম্পের উপর ঘন নীল সিল্কের ঘেরটোপ কোথা থেকে এল? স্বল্পালোকিত ঘরে চারিদিকে অদ্ভুত আবছায়া। একি, দত্তদের বাড়ীর বেণু এখানে মেজেতে ঘুমোচ্ছে কেন আর রাণু, রাণু এই দরজার চৌকাটের ওপর শুয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে! জানালাগুলো বন্ধ করলে কে?

দরজা পেরিয়ে ঠাকুমা করিডরে এসে দাঁড়ালেন। সিঁড়ির

বারান্দায় সব আলো জ্বলছে, চাকরগুলো মরেছে নাকি, আলো নেভাতেও ভুলে যায়।

ঠাকুমা দেখলেন সরমা আসছেন তার ঘরের দিকে, উদ্বিগ্ন ক্লান্ত মুখ।

ঠাকুমা ডাকলেন, বৌমা বৌমা। কোন উত্তর নেই। আবার চেঁচিয়ে ডাকলেন, অ বৌমা! কোন সাড়া নেই। সরমা নিঃশব্দে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

সহসা বাড়ীতে একটা ক্রন্দনের রোল উঠিল। অন্ধকারপুঞ্জে আগুনের নৃত্যময় শিখার মত রাত্রির নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদ। সমস্ত বাড়ী জেগে উঠেছে।

ঠাকুমা চকিতপদে ঘরে প্রবেশ করলেন। লাল পেটেণ্ট ষ্টোনের মেজের ওপর সাদা বিছানাতে এক বৃদ্ধা শুয়ে, তার চারিদিকে নানা বর্ণ ও আকৃতির ঔষধের শিশি, গেলাস, বই। বৃদ্ধা নিশ্চল নিঃসাড় শুয়ে আর তাঁর চারদিক ঘিরে সবাই কাঁদছে। সরমা তাঁর বুকের ওপর মুখ গুঁজে পড়েছেন, রাণু ভীত বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে, তার দুই চোখ দিয়ে জল টস্ টস্ করে পড়ছে!

কে এ বৃদ্ধা? ইনি মৃতা মনে হচ্ছে।

ঠাকুমা চমকে উঠলেন, এ যে তাঁরই দেহ। তা হলে তিনি মরে গেছেন। এখন তিনি বিদেহী আত্মা, সে জন্য কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। সে জন্যই সরমা তাঁর আহ্বানে উত্তর দেন নি।

আচ্ছা দেখা যাক তিনি মরে গেলে কে কেমন ভাবে শোক করে, তাঁকে কে সব চেয়ে ভালবাসে।

ধীরে ভোর হয়ে এল। উষার পাণ্ডুর আলোয় সমস্ত পাড়া জেগে উঠেছে। ঠাকুমার ঘরে ভয়ানক ভিড়।

ঠাকুমা দেখতে লাগলেন, ধীরে কান্নার বেগ থামল। এবার মৃতদেহ নিয়ে যেতে হবে। সতীশবাবু এসে বল্লেন, পিসিমা মরলেন ত এই সোমবার দেখে মরলেন, কাল মরলে আর আফিস কামাই হত না।

মৃতদেহ গরদের কাপড়ে জড়ান হল। এক ঘণ্টার মধ্যে এত ফুল এল কোথা থেকে। কি সুন্দর সদ্য প্রস্ফুটিত শুভ্র পদ্মগুলি, ফুলে ফুলে বিছানা ভরে গেল।

সবাই ঠাকুমার পায়ের ধুলো নিয়ে চোখ মুছলেন। খাটিয়া যখন তুলছে, এমন সময় রাণু ঘরের কোণ থেকে ঝড়ের মত ছুটে এল, এতক্ষণ সে রোদন-অরুণ-নয়নে নির্ব্বাক মন্ত্রাহতের মত দাঁড়িয়েছিল! খাটিয়ার ওপর শ্বেত পদ্মদলের মধ্যে সে আছড়ে পড়ল,—কোথায় তোমরা নিয়ে যাচ্ছ ঠাকুমাকে, আমি দেব না যেতে। চোখে অশ্রু নেই, শুধু বালিকা-কণ্ঠে করুণ ক্ষুব্ধ গর্জ্জন।

সরমা তাকে টেনে তুলে নিলেন, সে চেঁচাচ্ছে, হাত পা ছুঁড়ছে—দেবো না, নিয়ে যেতে দেবো না। সে বুঝি একটা কাণ্ড বাধায়। আবার খাটিয়ার ওপর ছুটে গিয়ে পড়ে।

তার বাবা তাকে জোর করে ধরে রাখলেন। এবার সে কাঁদতে আরম্ভ করলে, শ্রান্ত হয়ে মেজেতে লুটিয়ে পড়ল। তার

কান্না দেখে তার ছোট ভাই-বোন সব পাড়ার ছেলেমেয়েরা সমস্বরে কেঁদে উঠল। শিশুদের কান্নায় প্রভাতের সুনির্ম্মল আলোক করুণ সজল।

ফুলভরা খাটিয়া নিয়ে পাড়ার ছেলেরা বাড়ী থেকে রাস্তায় বার হল। যুবকসঙ্ঘ মৃতদেহ সৎকারের ভার নিয়েছে। সতীশ-বাবুকে কিছু দেখতে হবে না, তাঁকে কিছু করতে দেবে না। সতীশবাবুকে তারা বল্লে, আপনি বাড়ী থাকুন, রাণুকে দেখুন। পাড়ার কয়েকজন বালিকা বল্লে তারাও যাবে মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে, শুধু পায়ে দল বেঁধে যাবে, তাদের মা রা আপত্তি করতে পারলেন না। কয়েকজন প্রৌঢ়াও দলে জুটলেন, সকালে গঙ্গাস্নান করে আসা যাবে। বালিকা-বৃদ্ধা নিয়ে দল ধীরে ধীরে চল্ল।

কে একজন বলে উঠল, ওরে ডাক্তারের সার্টিফিকেট ? দলের একজন নবীন ডাক্তার বল্লে, আমি লিখে দেব, কিন্তু ঠাকুমার নাম কি ?

ঠাকুমার নাম কেউ জানে না। তিনি রাণুর ঠাকুমা, এই সবাই জানে।

একটি যুবক ছুটিল সরমার কাছে, ঠাকুমার নাম জানতে !

প্রভাতের কোলাহলময় সহরের পথে সবাই ধীরে চলছে। ঠাকুমাও চলেছেন তাঁর মৃতদেহের শোভাযাত্রার সঙ্গে।

নগরের পথ-দৃশ্য মিলিয়ে গেল।

শরৎকালের প্রভাত। নানা ফুলে ভরা অপরূপ উদ্যান। পূব-আকাশে খণ্ড মেঘগুলি রাঙিয়ে আলোর ধারা গলিত সোনার মত চারিদিকে ঝরে পড়ছে। চারিদিক শেফালি, কবরী, টগর, স্থলপদ্ম, অপরাজিতা, বিচিত্র বর্ণের ফুলে ছাওয়া। ডুরে শাড়ী পরে একদল ছোট মেয়ে ফুল তুলছে, খেলা করছে, কেউ আঁচলে শেফালি ফুল ভরছে, কেউ মাথায় রঙ্গনফুল পরছে, কেউ হাতে স্থলপদ্ম নিয়ে হাসছে।

তাদের মধ্যে একটি মেয়ে খয়ের রংএর শাড়ী পরে, একটু গম্ভীর প্রকৃতির। সে ফুল তুলছে না, এক বকুলগাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে শরতের সোনার আকাশের শোভা দেখছে। মেয়েরা বল্ল, চল ভাই আমরা নদীর ধারে খেলতে যাই। খয়ের রংএর শাড়ী পরা মেয়েটিও উঠল নদীর ধারে যাবার জন্যে। এমন সময় চাপা রংএর ফ্রক পরে একটি মেয়ে এল, ছেঁড়া ময়লা ফ্রক, দুষ্টামি-ভরা চোখ, এক হরিণ শিশুর গলায় দড়ি ধরে টানতে টানতে সে এল।

খয়ের রংএর শাড়ী-পরা মেয়েটির হাত সে চেপে ধরলে, জোর করে টেনে বললে,—তুমি ওদের সঙ্গে যেতে পারবে না, তুমি আমার সঙ্গে খেলা করো, তুমি আমার হরিণকে ঘাস খাওয়াও।

আবদার মন্দ নয়।

ঠাকুমা দেখলেন সে চাপা রংএর ফ্রক পরা মেয়েটি হচ্ছে রাণু, তার আবদার অগ্রাহ্য করে তিনি অন্য মেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে

নৌকা চড়তে যেতে পারলেন না। রাণুর হরিণকে নিয়ে তিনি ঘাস খাওয়াতে লাগলেন।

দৃশ্য বদলে গেল।

শ্রাবণের নদী কানায় কানায় ভরা! আকাশে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি। বর্ষার অপরাহ্ণ কখনও ক্ষণিক সূর্য্যালোকে দীপ্ত কখনও সঘন বারিপাতে সজল। গ্রাম্য পথ এক অতিবৃদ্ধ বটগাছের পাশে নদীর ধারে শেষ হয়েছে। নদীতে কয়েকটি নৌকা দুলছে টলছে, মাঝিরা হাঁকাহাঁকি করছে,—আরও দেরী হলে দহেতে রাত হয়ে যাবে, বড় নদীতে পড়তে কাল দুপুর, তাহলে রুণপুরে পরশু পৌঁছাবে।

বটগাছের তলায় দুই পালকী এসে থামল, এক পালকীতে বর, আর এক পালকীতে নব-বিবাহিতা বালিকাবধূ, শ্রাবণ স্রোতস্বতীর মত তার দুই নয়নে অশ্রু ছলছল করছে, অজানা স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় দুলছে।

পালকী থেকে নেমে এবার নৌকায় উঠতে হবে। পল্লীনারী-গণ চারিদিকে নব-বধূকে ঘিরে দাঁড়াল, অবগুণ্ঠনের প্রান্তে অমঙ্গল অশ্রুজল গোপন করল। শুভ-শঙ্খ ধ্বনিত হল, শ্রাবণ আকাশের তলেশূন্য নদী তীরে সে শঙ্খধ্বনি বড় করুণ শোনাল!

বটগাছের নীচে একটি ছোট মেয়ে বসেছিল, চাপা রংএর ফ্রক পরা, এতক্ষণ সে এক কাঠবেড়ালীকে পেয়ারা খাওয়াচ্ছিল।

ঝড়ের মত সে ছুটে এল ; ছেলেমেয়েদের ভিড় ঠেলে সে নববধূর লাল চেলির আঁচল টেনে ধরলে। দীপ্তকণ্ঠে বল্‌লে, কোথায় যাচ্ছ তুমি, তুমি যেতে পারবে না।

সদ্য বিবাহিতার বুক দুরু দুরু করছে, সে ম্লান হেসে বললে, হ্যাঁরে রাণু, তুই কি আমার শ্বশুর-বাড়ীও যেতে দিবি নি ?

কৌতুকভরা চোখ নাচিয়ে রাণু বল্লে, দেবনা ত, বা, পরশু, আমার পুতুলের বে, সব যোগাড় করবে কে ? বর-বউকে বরণ করে কে তুলবে শুনি ! আর সেই বাঘের গল্পটা তোমার শেষ হয় নি। চলো আমার সঙ্গে।

রাণু ঠাকুমার বাঙাশাখা পরান হাত টেনে গাঁয়ের পথে চলে গেল ; আলতাপরা পায়ে পথের কাঁদা মাড়িয়ে নববধূ বাঁশের বনের আড়ালে অদৃশ্য হল ; তার আর শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া হল না।

শ্রাবণ অপরাহ্ণ, অন্ধকার করে বৃষ্টি এল, চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল ; নৌকাগুলো ভরানদীর চঞ্চল জলে নৃত্য করতে লাগল।

নদীতীরের ছবি মিলিয়ে গেল।

সমতল বিজন বৃক্ষহীন প্রান্তর, যোজনের পর যোজন বিস্তৃত, অসীম দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, দগ্ধ তৃণ, রক্তিম পৃথিবী, উপরে জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নাকাশে সূর্য্য বিরাট অগ্নিপিণ্ডের মত। শূন্য প্রান্তরমধ্যে লালমাটীর পথ এঁকে বেঁকে গেছে দীপ্তচিহ্ন ভুজঙ্গমের ন্যায়।

অনল-ভরা জনহীন উদাস পথ দিয়ে একটি নারী চলেছে, সাদা কাপড় পরা, দেহে কোন অলঙ্কার নেই, অন্তরে অনির্ব্বাণ জ্বালা, সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত পথ, লক্ষ্যহীন আশাহীন যাত্রা; কণ্ঠে দারুণ পিপাসা, কোথাও একটু জল নেই, সূর্য্যালোকিত প্রান্তর মরীচিকার মত মাঝে মাঝে ঝিকমিক করে, আলেয়ার মত জ্বলে ওঠে। নিস্তব্ধ আকাশ রৌদ্রদহনে ঝিমঝিম করছে।

সহসা কে তাকে ডাকল। চমকে নারী চাইল। তার সামনে সুন্দর দীঘি, দীঘির পারে আমবন, জামবন, কত ফুল ফলের গাছ, শীতল জল, স্নিগ্ধ ছায়া, পরমা শান্তি। এ দৃশ্য তার চোখেই পড়ে নি, সে শূন্য নয়নে এ স্থান পার হয়ে চলে যাচ্ছিল।

একটি ছোট মেয়ে তাকে ডাকছে। চাপা রংএর ফ্রকপরা ছোট মেয়ে কোঁকড়া চুল দুলিয়ে সরু সোনার চুড়িগুলি বাজিয়ে তাকে ডাকছে,—ডাবের শাস খাবে, ভারি মিষ্টি?

নারীটি ম্লান হেসে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। রাণু তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তালগাছের তলায়, সাতটা তালগাছ মিলে সুন্দর কুঞ্জ রচিত হয়েছে।

ও, তোমার হাত কি গরম, মাথা যে রোদে পুড়ে গেছে, তুমি এখানে স্থির হয়ে বোসো, আমি তোমাকে মিষ্টি তালশাস দিচ্ছি।

তালশাস খেতে খেতে ঠাকুমার মনে হল, একি স্বপ্ন! জীবনের এ মাধুর্য্য কোথায় লুকান ছিল।

রাণু বল্লে, আচ্ছা টিকটিকিরা কোথায় থাকে জানো?

আমাদের ঘরের ছবির পেছনে তাদের বাসা, আর দেওয়ালে পোকা দেখলেই বাসা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে খেতে।

রাণু তাকে নিয়ে গেল কত অসম্ভবের রাজ্যে, কত রূপকথার দেশে। সে দেশে কত বিস্ময়, কত কৌতুক, কত আনন্দ!

সেদিন রাণুর স্কুলে হাফ হলিডে হয়েছিল। রাণু শীগগির স্কুল থেকে এসে বইয়ের ব্যাগটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে ঠাকুরমার ঘরের দিকে ছুটেছিল। রাণুর মা তাকে বল্লেন, রাণু এখন চুপ ক'রে শো দেখি, ঠাকুরমার ঘরে যেয়ো না, তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন।

বা, ঠাকুরমা বুঝি দুপুরে কখনও ঘুমোন। এখন ত তাঁর বই পড়া হচ্ছে।

না আজ তাঁর শরীর তেমন ভাল নেই, তিনি এখন বিশ্রাম করছেন।

আচ্ছা, বলে রাণু মায়ের পাশে বিছানাতে একটু শুল, তারপর উঠে চারিদিক ঘুরঘুর করতে লাগল। কাকাতুয়ার সঙ্গে খানিকটা খুনসুটি করলে, মিনি বেড়ালটাকে জ্বালাতন করলে, ড্রয়িংরুমের লাল মাছগুলিকে ময়দার গুলি খাওয়ালে। সময় যেন কাটতে চায় না।

আধঘণ্টা পর সে ঠাকুরমার ঘরে হাজির হল। ঘর নিঝুম, সবাই নিদ্রিত। খাঁচায় কেনারি-পাখীগুলো ঘুমুচ্ছে, টিকটিকিটা

এক বড় গঙ্গা ফড়িং খেয়ে নাক ডাকাচ্ছে, ঠাকুমা বিছানাতে ঘুমুচ্ছেন।

রাণু ঠাকুরমার পাশে মেজেতে বসল, খুটখাট, শব্দ করলে। তার আর ধৈর্য্য থাকে না। অবশেষে অধীর হয়ে ডাকল—ঠাকুমা, কত ঘুমোবে ?

ঠাকুমা জেগে উঠলেন। তাঁর চোখে তখনও কোন্ বন-হ্রদের মায়া জড়ান। রাণুর সঙ্গে তিনি শাল বনের ভেতর দিয়ে পাহাড় পার হয়ে নীল হ্রদের তীরে এসেছেন।

ঠাকুমা জেগে চমকে চাইলেন। রাণু! তাঁর সাম্‌নে রাণু! যেন কোন অচেনা মেয়ে বসে। স্বপ্নের কথা তাঁর মনে হল। মৃদু মধুর হাসি খেলে গেল সমস্ত মুখে।

নিমাই

কোন স্থানে দীর্ঘকাল ধরিয়া টিকিয়া থাকা নিমাইএর ভাগ্যে সয় না। জন্ম হইতেই তাঁহার ভবঘুরে জীবন আরম্ভ হইয়াছে। আঁতুড়ঘরেই তিন দিনের ছেলে রাখিয়া তাহার মা মারা গেলেন, মাতৃকোল হতে সে ধাত্রী-কোলে স্থানান্তরিত হইল। একমাস যাইতে না যাইতে তাহার ঝি বুড়ী মার অসুখের নাম করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেশে চলিয়া গেল। মাতা বসুন্ধরা নিমাইকে আপন বিরাট কোলে তুলিয়া লইলেন।

যে রুক্ষস্বভাবা কলহপ্রসিদ্ধা বিধবা ভগিনী পত্নীহীন ভ্রাতার সংসারের ভার আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইতে ছুটিয়া আসিলেন, তিনি সংসারের বৃহৎ বোঝার সহিত এই ছোট শিশুটির ভার লইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেখিবার সময় কোথায়? সকালে উঠিয়া পূজা-আহ্নিক করিতে কয়েক ঘণ্টা কাটে; তার পর ঝির সহিত বকুনি, নূতন রাঁধুনির সহিত ঝগড়া, আর গোবরজল দিয়া বাড়ীর সব ঘর শুদ্ধ করিয়া তুলিতে সকালটা কাটিয়া যায়। দুপুরে একবার সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া ইন্‌স্পেক্ট না করিয়া আসিলে নয়। বিশেষতঃ, দিন-দিন চারিদিকে যেরূপ অনাচার বাড়িয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যায় মালা করিতে, আর কত কষ্ট সহিয়া কত টানাটানি করিয়া যে এই অকর্ম্মণ্য ঝি-চাকর লইয়া সংসার চালাইতে হইতেছে তাহার গল্প বলিতেই কাটিয়া যায়।

কিন্তু সব অযত্ন সহিয়াও মাতা পৃথিবীর জল-হাওয়ায় নিমাই ঠিক বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। যাকে বাঁচিতেই হইবে, তাহার দুধে জল ঢালিয়া দুধের দাম ব্রাহ্মণ-দক্ষিণায় দিলেও সে মরিবে না। শিশু নিমাই এ উপেক্ষা বড় গ্রাহ্য করিত না। মলিন দূষিত কাঁথার উপর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইত। মাঝে-মাঝে ক্ষুধা পাইলে কাঁদিয়া উঠিত বটে, কিন্তু একটু ঘোলা ঠাণ্ডা দুধ পাইলেই শান্ত হইত। যখন তাহার অন্ধকার ঘরের ছোট জানালা দিয়া রোদ আসিয়া পড়িত, পাশের গাছগুলি বাতাসে দুলিয়া মর্‌মর্ শব্দ করিত, কয়েকটি ঘুঘু অবিশ্রান্ত ডাকিয়া সমস্ত আকাশ মুখর করিয়া তুলিত, নিমাই সকল অনাদর ভুলিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিত। সেই শূন্য ঘরে মাতৃহীন শিশুর বক্ষ মাতা বসুন্ধরা আনন্দ-সুধায় ভরিয়া দিতেন। আর রাত্রি-বেলা হঠাৎ জাগিয়া পিতা যখন ঘুমন্ত শিশুর মুখে চুম্বন করিতেন, সে কি সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হাসিয়া উঠিত।

এ পিতার আদরও বেশী দিন সহিল না। তখন সে প্রায় দুই বছরের। পরম প্রতাপশালিনী পিসিমায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া, মাতালের মত টলিয়া সে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়ায়,—ছোট বাড়ীতে এই শিশু আবিষ্কারক চারিদিক পর্য্যটন করিয়া যেন কোন্ নূতন দেশের সন্ধান লইবে। মাঝে মাঝে সহসা পিতার পথরোধ করিয়া, হাসিয়া অস্ফুট স্বরে ডাকিয়া উঠিত,—বাবা। কিন্তু যখন জনহীন ঘরে জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া, আকাশ মাঠ-আলোর দিকে চাহিয়া আপন মনে

ডাকিত, বা,—বা, আর হাসিত, হাসিত আর ডাকিত,—সে আহ্বান কাহার জন্য, ঠিক বোঝা যাইত না। হয়ত সুন্দরী প্রকৃতি মাতার শোভায় পুলকিত হইয়া আনন্দধ্বনি করিত। দুই বৎসর বয়সের সময় তাহার বাবা তাহার ভার পৃথিবী-মাতার হাতে দিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। পিসিমা সংসারের পাপের মোহ বন্ধনে বাঁধা থাকিতে কিছুতেই চাহিলেন না,—পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে তীর্থ করিতে এই মায়ার জাল লইয়া কি করিয়া যাইবেন? নিমাইকে তাহার এক বোনের বাড়ী জোর করিয়া ফেলিয়া দিয়া, কাশীর নাম করিয়া বাহির হইয়া কলিকাতায় তাঁহার মেজ ছেলের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

ধীরে ধীরে নিমাই জেঠাই, খুড়ি, পিসি, মাসি, দিদি, নানা-জনের নানাঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনাদর সহিয়া তবু ঠিক বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। বকুনি সে মোটেই গ্রাহ্য করিত না। পড়িয়া গেলেও লজ্জায় কাঁদিতে পারিত না। আর ক্ষুধা পাইলে খাবার, কি রান্নাঘরে গিয়া যাহা পাইত, মুখে পুরিত।

যতদিন নিমাই ছোট ছিল, সে খাইত কম; কাপড় জামার কোনও দরকার ছিল না। আপন মনে হাসিত, কাঁদিত, কোনো হাঙ্গামা ছিল না। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সহিত তাহার অভাব-বৃদ্ধির বোধ বাড়িতে লাগিল। খাইতে না দিলে সে কাড়িয়া খাইত; কিছু পরিতে না দিলে, সে তাহার কোনো পিসতুতো বা খুড়তুতো ভাইবোনের কাপড় জামা অম্লান বদনে পরিয়া, পাড়ার

ছেলেদের সহিত খেলিতে পলাইত; তাহার পরে কাপড় জামায় ধূলা লাগাইয়া, ছিঁড়িয়া, হারাইয়া আসিত। বকিলে সে গ্রাহ্য করিত না। খুব মারিলে গুম হইয়া শুইয়া ধূলায় লুটোপুটী খাইত। দিন-দিন তাহার দুষ্টামি বাড়িয়া যাইতেছিল।

তাহার বয়স প্রায় সাত হইবে। তখন সে তাহার ছোট কাকীর ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছিল। ছোটকাকী এই দুরন্ত ছেলেটিকে শীঘ্রই শান্ত করিয়া, কি করিয়া ছেলে শাসন করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত সকলকে দেখাইবার জন্য, কিছুদিনের জন্য নিমাইএর ভার লইয়াছিলেন। নিমাই পূর্ব্বদিন হাঁড়ি হতে তেঁতুল, আচার চুরি করিয়া, তাঁহার মেয়ের একখানি কাপড় পরিয়া কোথায় গিয়াছিল, কাপড়খানি হারাইয়া আসিয়াছে। ছোটকাকী বলেন, ওর সব বজ্জাতি, সে কাপড় ও কাকে দিয়ে এসেছে। বাস্তবিক নিমাই কাপড়টি এক চাষার মেয়েকে দিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না। ছোটকাকী তাহাকে সারাদিন কিছু খাইতে না দিয়া, এক ঘরে পুরিয়া, দরজায় শিকল দিয়া রাখিয়াছিলেন। নিমাই কিছুক্ষণ দরজায় লাথি মারিল, কিছুক্ষণ জানালার গরাদ ধরিয়া চেঁচাইল, তার পর শ্রান্ত হইয়া মেঝেতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বিকেলে নিমাইএর এক গ্রাম-সম্পর্কের মাসি তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ব্যাপারটা জানিতেন না। বিকেলে উঠিয়া ক্ষুধিত হইয়া নিমাই খুব জোরে দরজায় লাথি মারিতেছিল, তিনি শব্দ শুনিয়া খুলিয়া দেন। দরজা খুলিতেই সে

উন্মত্তের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া, তাঁহার আঁচল ধরিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া এক কাণ্ড বাধাইয়া দিল। ছোটকাকী কাছে ছুটিয়া আসিতেই, তাঁহার চুল ধরিয়া টানিয়া, অভদ্র ভাবে গালাগালি দিল। ছোটকাকী ক্রোধে আত্মহারা হইয়া নিমাইএর গালে সজোরে এক চড় মারিলেন। সারাদিন না খাইয়া সে খিন্ন হইয়াছিল; চড় খাইয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ছোটকাকী তখনও ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিলেন; এক লাথি মারিয়া অচৈতন্য, নগ্ন, বুভুক্ষু বালকটিকে নর্দ্দমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া সংসারের কাজে চলিয়া গেলেন।

সেই সন্ধ্যায় গ্রামের মাসী নিমাইকে বুকে তুলিয়া আপন ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়ীর কেহ কিছু বলিল না; আপদ বিদায় হইল। বিধবা মাসির এক ছোট মেয়ে ছিল বটে কিন্তু কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার মনে বড় খেদ ছিল, এতদিনে তাহা দূর হইল। মাসির বাড়ী গিয়া নিমাই কিছুদিনের জন্য শান্ত হইল। পাড়ার ছেলেদের দলে তাহাকে বড় দেখা যাইত না, মাসির পিছনে-পিছনে বডিগার্ডের মত সে ঘুরিত, ঘরকন্নার নানা কাজে সে সাহায্য করিত, আর মাসির ছোট মেয়েটির বাহক-পদে নিযুক্ত হইল। তাহাকে আদর করা, আবোল-তাবোল বকিয়া নানা সুর করিয়া ঘুম পাড়ানো, কত কাজ সে মাসির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজে করিতে আরম্ভ করিল।

মাসির ঘরও তাহার বেশীদিন সহ্য হইল না। দত্তদের বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে গ্রামে এক যাত্রার দল আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছিল। নিমাইএর কাণে কথাটা পৌছাইতেই, সে লুকাইয়া গিয়া যাত্রার দলের ছেলেদের সহিত ভাব করিয়া আসিল। রাত্রে আসিয়া বায়না ধরিল যাত্রা শুনিতে যাব। কিন্তু ছোট বোনটির যে অসুখ, যাত্রা শোনা স্থগিত রহিল। দুইদিন পরে ছোট বোনটি সারিয়া উঠিলে সে তাহাকে কোলে করিয়া মাসিকে লইয়া যাত্রা শুনিতে গেল! যাত্রা দেখিয়া-শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। ছোট ছেলেরা কেমন সখি সাজিয়া গান করে, জুড়ীরা কত রকম মুখভঙ্গী করে। আর যখন অর্জ্জুন তীর ছুড়িল, ভীষ্মের বুক হইতে রক্ত ঝলকে-ঝলকে উঠিতে লাগিল, সে লাফাইয়া চেঁচাইয়া বলিল, ওরে মেরে ফেললে। মাসি মুখে হাত দিয়া থামাইয়া বলিলেন, চুপ্ চুপ্, ও রক্ত নয়, লাল জল! আশ্বস্ত হইয়া সে ছোট বোনটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

ঘরে আসিয়া নিমাই বলিল, মাসি, আমি যাত্রা করবো।

কোরবে বাবা, বড় হও।

না মাসী, ওই যাত্রার দলে আমার চেয়েও ছোট ছেলে আছে, আমি ওদের সঙ্গে চলে যাবো।

ছিঃ বাবা, আমায় ছেড়ে চলে যাবে, খুকি কাঁদবে, দেখবে কে?

তাও তো বটে। সমস্ত রাত নিমাই ভাবিল, সে চলিয়া গেলে খুকির বাস্তবিক কোনো কষ্ট হইবে কি না। কেন, সে ত হাঁট্‌তে পারে, কথা কহিতে শিখেছে। আর মাসিই ত তাকে স্নান করায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, সে আর কি করে!

সমস্ত দিন সে খুকির কাছে কাটাইল। সন্ধ্যার সময়ে চুপে-চুপে বাহির হইয়া, যাত্রার দলের নৌকায় গিয়া, লুকাইয়া তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

যাত্রার দল প্রথম-প্রথম তাহার খুব ভাল লাগিত। নূতন-নূতন ছেলেদের সঙ্গে ভাব করিয়া, তাহাদের সহিত খেলা, গল্প করিয়া বেশ মজায় দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু একটু পুরাতন হইয়া গেলে অধিকারী যখন ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, যাত্রার সময় ঘুমাইয়া পড়িলে মারিয়া জাগাইয়া তুলিত, গাইতে ভুল হইলে বা ঘুমের ঘোরে কথা ভুলিয়া গেলে অনশনের বা অর্দ্ধাশনের ব্যবস্থা হইত, তখন যাত্রা-জীবনের উপর তাহার কোনো আকর্ষণ রহিল না। মাসিমায়ের স্নেহ-আদর মনে পড়িত, খুকির হাসি-চাউনি, ছোট ছোট নরম হাত দুটির কোমল স্পর্শের কথা ভাবিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যাইত।

অনেক জায়গায় ঘুরিয়া যাত্রার দল এক বড় জমিদারের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে রাত্রির পালায় নিমাই একটা গান বড় করুণ সুরে গাহিতেছিল। গান গাহিতে-গাহিতে খুকির কথা বার বার মনে পড়াতে, তাহার গলা ভিজিয়া আসিতেছিল, সুর তাহার বুকের তারগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বাহির হইতেছিল। শ্রোতারা সব অভিভূত হইয়া উঠিল। প্রৌঢ় পিতার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া জমিদারের ছোট মেয়ে আবেগদীপ্ত নিমাইএর মুখের দিকে চাহিয়া, চোখের জল রাখিতে পারিতে-ছিল না। সে গানের সব কথা বুঝিতে পারিতেছিল না বটে,

কিন্তু কিসের ব্যথায় তাহার ছোট মন উথলিয়া উঠিতেছিল। পরদিন দুপুরে জমিদার বাড়ীর পুকুরের ঘাটে নিমাই গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান গাহিতেছিল, সে মেয়েটি আসিয়া বিস্ময়-করুণ নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। নিমাই স্নিগ্ধ চোখে চাইতেই ছোট নোলোক দুলাইয়া কাছে আসিয়া সে চুপে চুপে বলিল, তুমি বেশ গান গাইতে পার ত ভাই।

তোমার ভালো লেগেছে?

ভারি ভালো লেগেছে।

এখন গাইব? কোন্‌ গানটা?

না ভাই, এখন গেয়ো না, তোমার সে গানটা শুনলে আমার কান্না আসবে।

তুমি এই জমিদারের মেয়ে না?

হাঁ, তোমার নাম কি ভাই?

নিমাই।

তোমার?

লক্ষ্মী। আচ্ছা, আমার ভারি গান শিখতে ইচ্ছে করে।

শেখ না কেন?

কে শেখাবে?

আমি।

তুমি শেখাবে?—তুমি ত যাত্রার দলের সঙ্গে চলে যাবে।

না, যাবো না। আমি আর এই যাত্রার দলের সঙ্গে থাকব না। ওরা মারে, খেতে দেয় না।

তবে কোথায় থাকবে?

তা জানি না—ওদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবো!

আমাদের এখানে থাকবে?

তোমরা জমিদার, তোমরা রাখবে কেন?

আমি বাবাকে বলব,—আমায় গান শেখাবে।

হুঁ!

আচ্ছা ভাই, আমি বাবাকে ঠিক্ বল্ব।

ছোট মল বাজাইয়া লক্ষ্মী ধীরে চলিয়া গেল। নিমাই যাত্রার দলে থাকিবার ঘরগুলির দিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া, কতকগুলি ঢিল কুড়াইয়া পুকুরের জলে ছুড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আদুরে মেয়ের আব্দার বৃদ্ধ পিতা ঠেলিতে পারিলেন না। জমিদার-বাড়ীর নানা পোষ্য অপবর্গের মধ্যে নিমাইও অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। জমিদার ও তাঁহার মোসাহেবদের তামাক সাজিয়া, ফরমাস্ খাটিয়া, লক্ষ্মীকে গান শুনাইয়া, গল্প করিয়া, তাহার দিন বেশ কাটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বাড়ীর মেয়েরাও তাহাকে ডাকিয়া গান শুনিতেন, অভিনয় দেখিতেন, অন্দরমহলে তাহার খাতির বাড়িয়া গেল। দ্বিপ্রহরে সম্মুখের আম্র-বাগানে গিয়া নিমাই ও লক্ষ্মী নানা প্রকার কুপথ্য তৈরী করিয়া খায়, ও নানা প্রকার কুরুচিকর সঙ্গীত গায়। নিমাই বাড়ীর নিষ্কর্মা ও

তোষামোদকারীদের অঙ্গভঙ্গী ও চাটুবাদের ব্যঙ্গ করে, আর লক্ষ্মী হাসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। ব্যাপার গুরুতর হইতেছে দেখিয়া জমিদারবাবু নিমাইকে নিকটের এক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। স্কুল বস্তুটি কিরূপ জানিবার জন্য নিমাই প্রথম প্রথম স্কুলে যাইত। কিছুদিন গিয়া যখন দেখিল, স্থানটা বড় অসুবিধার নয়, কয়েক ঘণ্টা ঘানির গরুর মত বাধা থাকা, পড়া না করিয়া গেলে মার খাওয়া, এ সব তাহার বেশীদিন সহ্য হইল না। স্কুলঘরের অপেক্ষা স্কুলে যাইবার পথের দুই ধারে বাগান ও পুকুর লোভনীয়, মোহনীয়। লক্ষ্মী ছিল নিমাই-এর ব্যাঙ্ক। সে পিতার নিকট প্রায়ই টাকা পাইত। নিমাই সেই টাকা লইয়া কতকগুলি স্কুলের ছেলেকে বশ করিয়া আপনি দলপতি হইয়া স্কুল পালাইয়া বাগানের পর বাগান ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মালিরা যথামত ঘুষ পাইয়া কাহাকেও কিছু জানাইত না।

এইরূপে কোনদিন স্কুল পালাইয়া পরের বাগান ভাঙ্গিয়া, পরের পুকুরে স্নান করিয়া, ছেলের দল লইয়া হল্লা করিয়া, পাড়া মাতাইয়া, কোনদিন স্কুলে গিয়া পড়া না পারিয়া মাষ্টারের সহিত ঝগড়া করিয়া হেড্‌মাষ্টারের মার খাইয়া; কোন ছুটির দিন লক্ষ্মীর সহিত তাহাদের বাগানে লুকাইয়া গল্প করিয়া, জমিদার বাড়ীর সকলের আদর-অনাদর সহিয়া, সকলের ফরমাস্ আবদার পালন করিয়া, পরম সুখে নিমাই-এর কয়েক বছর কাটিয়া গেল। ধীরে-ধীরে লক্ষ্মী বড় হইয়া উঠিল ; বালক-বালিকার সরল খেলা ভাঙ্গিয়া গেল, আর নিমাইএর কাছে সে তেম্‌নি সহজ হাসিয়া আসে না, তেম্‌নি আদরে,আব্‌দারে,

কথা কয় না, তাহার বড় লজ্জা করে। তাহার পর একদিন জমিদার বাড়ীতে বিবাহের নহবৎ বসিল, নিমাই-এর কিশোর-প্রাণ উদাস করিয়া সানাই বাজিতে লাগিল, কোথা হইতে এক অজানা-লোক বরবেশে আসিয়া লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বিবাহের পরদিন নিমাইকে আর কেহ সেই গ্রামে দেখিতে পায় নাই। রাত দুইটার সময় লগ্ন পড়িলে সে লক্ষ্মীর পিঁড়ির একধার ধরিয়া তাহাকে ছাঁদ্না-তলায় লইয়া আসিয়া সাতপাক ঘুরাইল; শুভদৃষ্টি হইয়া গেলে বিবাহ-সভায় লক্ষ্মীকে বসাইয়া, জমিদার-বাড়ী ছাড়িয়া, অন্ধকার পথে বাহির হইল। সেই রাতেই ষ্টেশনে গিয়া সম্মুখে যে ট্রেণ পাইল উঠিয়া বসিল। কোন্ ক্লাসে উঠিতেছে তাহা দেখিল না, ট্রেণ কোথায় যাইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিল না। শূন্য-মনে চলন্ত গাড়ীর জানালার পাশে বসিয়া রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। সকালে ট্রেণ তাহাকে কলিকাতায় নামাইয়া দিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সারাদিন পথে-পথে ঘুরিয়া নিমাই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক বক্র সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকিয়া সে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। বৈশাখী সন্ধ্যা ঝঞ্ঝা-ঘন হইয়া উঠিল। ঝোড়ো হাওয়ায় ধূলি-বালি উড়াইয়া তাহার চোখ-মুখ ভরিয়া দিল। আকাশে মেঘ ছাইয়া পথের আলো নিভিয়া গেল। তার পর বৃষ্টি নামিল। নিমাই-এর বড় রাগ হইল।

সারাদিন সে প্রায় কিছুই খায় নাই। যা কিছু পয়সা ছিল, টিকিট-কলেক্টর নিয়াছে, বাকী পয়সা এক ভিখারীকে দিয়া দিয়াছে। ভাবিয়াছিল, এখানে কোনো নূতন পিসি কি মাসি পাইবে। কিন্তু এ যে জনপূর্ণ মরুভূমি, এ পাষাণ-পুরীতে কোথায় স্নেহের নীড় মিলিবে? তাহার উপর এরূপ ঝড়-জল আসাতে তাহার বড় রাগ হইল। জোরে কয়েকবার পথের খোয়ার উপর লাথি মারিল। তাহার পর সাম্‌নে যে বাড়ী পাইল, তাহার বন্ধ-দ্বারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। কেহ দ্বার খুলিয়া দিল না। দুয়ারে জোরে লাথি মারিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে তখন বজ্র হাঁকিতেছে, বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে একটি দশ এগার বছরের মেয়ে দরজা খুলিয়া দিতেই, সে জোরে ঢুকিয়া প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল। তাহার দিকে ক্ষোভের সহিত চাহিল, কেন সে এতক্ষণ দরজা খোলে নাই। মেয়েটি পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি, কি চাই? নিমাই চুপ করিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে তাকাইল। তাহার গা হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। মুখে ক্রোধ, বিস্ময়, আনন্দ জড়াইয়া কিসের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। নিমাই-এর মূর্ত্তি, তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল। হাসিতেছে! হঠাৎ ক্রোধে অধীর হইয়া, নিমাই মেয়েটির মুখে এক চড় বসাইয়া দিল। মেয়েটি চেঁচাইয়া উঠিল, মাগো, মেরে ফেল্‌লে।

কি—কে বলিয়া মেয়ের মাতা ছুটিয়া আসিলেন। হঠাৎ চড় মারিয়া অতি লজ্জিত হইয়া নিমাই সকরুণ নয়নে মেয়ে ও তাহার

মাতার দিকে চাহিল। মা আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? তাঁহার হাতে একখানা হাতা ছিল, চোর আসিয়াছে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। ভীত নয়নে ছাতাটির দিকে চাহিয়া কাতর-কণ্ঠে নিমাই বলিল, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে যে। তাহার কণ্ঠ শুনিয়া মাতার মন গলিয়া গেল, মেয়েটি হাসিয়া উঠিল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি?

আমি নিমাই।

কোথায় তোমার বাড়ী?

বাড়ী নেই।

কোথায় থাকো?

কোথাও থাকি না,—ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

তোমার বাপ নেই?

না।

মা?

না।

কেউ নেই?

কেউ না।

কি জন্যে দরজা ঠেলছিলে?

আমি কোথায় যাব, পথ দেখতে পাচ্ছিলুম না যে।

মাতা ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন; মেয়েকে বলিলেন, কমলা, একটা কাপড় নিয়ে আয় ত?

চোর যদি হয় মা?

না রে না, ও চোর হ্তে পারে না।

কমলা তাড়াতাড়ি বাবার কি দাদার কোন কাপড় খুঁজিয়া পাইল না, নিজেরই একটা পাছাপেড়ে লাল সাড়ী আনিয়া হাজির হইল। নিমাই তাড়াতাড়ি কাপড় বদলাইয়া প্রসন্ন মুখে রান্নাঘরে ঢুকিয়া খাইতে বসিয়া গেল। খাওয়ার পর তৃপ্তির সহিত কমলার দিকে চাহিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। কমলা তখন কি তরকারী কুটিবে জোগাড় করিতেছিল,—সে তাড়াতাড়ি বঁটিটা টানিয়া লইয়া, আলু ও বেগুন কুটিয়া, বেলুন লইয়া বলিল, লুচি আর ভাজ্‌বে মাসিমা ?

পরদিন হইতে নিমাই কমলাদের পরিবার-ভুক্ত হইয়া গেল। সে দেখিতে সুশ্রী, বুদ্ধিটাও মোটা নয়। বংশ ভালো, এ কন্যাদায়-গ্রস্ত যুগে সে পরে কাজে লাগিতেও পারে। কমলার বাবা নিমাইকে এক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এখানে পুকুর নেই, আম-বাগান নেই। সেই খোলা মাঠ, দীঘির পাড়, দুরন্ত ছেলের দলের জন্য নিমাই-এর মন মাঝে মাঝে ব্যথিত হইয়া উঠিত। কিন্তু বসিয়া ভাবিয়া মন খারাপ করাটাকে সে মোটেই প্রশ্রয় দিতে পারিত না। সে সম্মুখে যাহাকে পায়, তাহাকে যেমন মনপ্রাণ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভালোবাসে, তেমনি যাহাকে ছাড়িয়া আসে, তাহাকে নিশ্চিন্ত ভাবে ভুলিয়া যায়। নূতন সাথীর সহিত মিলনের আনন্দকে বিগত-জনের বিচ্ছেদ বেদনার স্মৃতি দিয়া ম্লান করিতে চাহে না।

নূতন বন্ধু জুটাইয়া লইতে তাহার বেশী দেরী হইল না। ক্লাসের দুষ্টু বিদ্রোহী ছেলের দলের সে নেতা হইল। খেলার দলের

সেক্রেটারী হইল। আর মাঝে-মাঝে বন্ধুদের সহিত ঝগড়া করিয়া, কমলার সহিত সকাল-সন্ধ্যা খুনসুটি করিত। তা ছাড়া, মাসিমার বাজার করা, ভাঁড়ার ঘর গোছানো, ঘরের টেবিল চেয়ার সাজানো নিমাই না হইলে কিছুই হইবে না। ছোট ছেলে-মেয়েদের সে মাষ্টার হইল। তাহাতে তাহাদের পড়া শুনা বড় হইত না বটে, কিন্তু তাহাতে তাহারা কোনদিন দুঃখ প্রকাশ করে নাই; কেন না, ঘুড়ি তৈরি করিতে সে ওস্তাদ ছিল। লাট্টু ঘোরাইতে, মার্ব্বেল খেলিতে, তাহার মত গ্রামের স্কুলের কেহ ছিল না, সহরে আসিয়াও সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রহিল। স্কুলের ম্যাচের টাই তৈরি করিয়া, ম্যাচ খেলিয়া, পাড়ার কনসার্ট-পার্টিতে বাঁশী বাজাইয়া, বছর বছর পাড়ার থিয়েটারে নায়িকা সাজিয়া, ও মাষ্টারদের বাড়ী-বাড়ী হাঁটিয়া কাঁদিয়া ক্লাসে উঠিয়া, কমলার নিমাই-দার কয়েক বৎসর বেশ সুখে কাটিয়া গেল।

কিন্তু সুখ তো তাঁহার ভাগ্যে সয় না। পাড়ার সকলে বলিতে লাগিল, সে বকাটে হইয়া যাইতেছে। স্কুলের মাষ্টারেরা বলিলেন, তাহার জন্য স্কুলের ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইতেছে। কমলার দাদা একদিন তাহাকে পথে সিগারেট খাইতে দেখিয়াছিলেন, আর এক-দিন কলিকাতার কোনো কুস্থানে কু-গলিতে ঘুরিতেও দেখিয়াছেন। তাহার বন্ধুর দলও বড় সুবিধার ছিল না। কমলার পিতা বারবার সাবধান করিয়া দিলেন; কিন্তু তাহার স্বভাবের, অভ্যাসের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। রাতে আড্ডা হইতে প্রায়ই সে খুব দেরী করিয়া বাড়ী ফিরিত। কমলা চুপে চুপে দরজা খুলিয়া

দিত, তাহার জন্য বকুনিও কম খাইত না। তাহার খাবার চাপা থাকিত। একদিন কমলার বাবা রাগিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সে যেমন অসহায় ভাবে আসিয়াছিল, তেমনি অসহায় ভাবে চলিয়া গেল।

তাড়াইবার কয়েকদিন পরে একদিন রাতে দরজায় আসিয়া নিমাই ধাক্কা দিতেছে, কমলা দ্বার খুলিয়া দিল না ; সে পাশের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। নিমাই অশ্রুসিক্ত স্বরে বলিল, কমলা, দরজাটা খুলে দাও,—জানো আমার দুদিন খাওয়া হয়-নি।

না, দরজা খোলা হবে না।

আমি বাস্তবিক খারাপ হইনি কমলা।

তা জানি নিমাইদা, লোকে মিথ্যা কথা বলে।

নিমাই মৃদু হাসিয়া বলিল, তবে দরজাটা খুলে দাও।

না, বলিয়া জানালা ভেজাইয়া দিয়া, কমলা আপন ঘরের বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে গেল। কমলা অনেক দিন নিমাই-দার জন্য অনেক বকুনি সহিয়াছে ; কিন্তু আজ সকালে তার নামের সহিত নিমাইদার নাম জড়াইয়া দাদা যেরূপ ইঙ্গিত ও ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, এ জন্মে আর নিমাইদার মুখ দেখিবে না।

নূতন আশ্রয় জুটাইয়া লইতে নিমাই-এর বেশী দেরী হইল না। স্কুলে যাইবার পথে নিমাই রোজ দেখিত, একটি মেয়ে একগাদা বই লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গাড়ী করিয়া পড়িতে যায়। মেয়েটিকে বেশ দেখিতে। যতক্ষণ সে বাড়ীর দরজা হইতে বাহির

হইয়া ফুটপাথ পার হইয়া গাড়ীতে উঠিত, নিমাই আনন্দের সহিত চাহিত। কিন্তু মেয়েটিকে দেখিতে বড় ; খোঁজ লইয়া জানিয়াছিল সে কলেজে পড়ে, নাম মাধুরী, বয়সে তার চেয়ে বড় হইবে। কয়েকদিন কয়েক বন্ধুর বাড়ীতে খাইয়া কাটিয়া গেল। তার পর একদিন সটান সে মাধুরীদের বাড়ী ঢুকিয়া, চাকর দিয়া মাধুরীকে ডাকাইয়া পাঠাইল। মেয়েটি আসিলে, সে একটু মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মাধুরী-দিদি, আমি তোমাদের বাড়ী থাকব। তাহার স্কুলের দু-একজন ছেলের নিকট হইতে সে কিছু আদব-কায়দা শিখিয়া লইয়াছিল। মাধুরী এরূপ এক অপরিচিত বালকের অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, থাকবে কি রকম ?

হাঁ মাধুরী-দিদি, আমার কেউ নেই, কোথায় থাকি ?

তা বটে, তাহার কেহ নাই। সে যখন দিদি বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে, তখন থাকিবার অধিকারের দাবী করিতে পারে। মাধুরী বলিল, তোমার কেউ নেই কি ? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?

আমি আগে যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

তাড়িয়ে দিয়েছে ? নিশ্চয় তুমি খুব দুষ্ট,—তোমায় দেখে তাই বোধ হচ্চে,—যাও, সেখানে ফিরে যাও।

নিমাই কাঁদিয়া ফেলিল, না মাধুরী দিদি, সেখানে আমাকে কিছুতেই নেবে না,—আমি কোন খারাপ কাজ করিনি, লোকে আমার নামে মিথ্যে লাগিয়েছে। একে দিদি বলিয়া ডাকা, তার পর কান্না, আর ছেলেটিও দেখিতে বেশ সুশ্রী। সুতরাং নিমাই মাধুরী-দিদির আশ্রয় লাভ করিল।

মাধুরী-দিদির বাড়ী আসিয়া নিমাইকে সব কুসঙ্গ, আড্ডা ত্যাগ করিতে হইল। দিদির শাসন এত কঠিন হইবে জানিলে সে হয়ত আসিত না, সে জীবনে এই প্রথম একজনকে একটু ভয় করিল। মাধুরীর বকুনিতে সে সত্যই ভয় পাইত। মাধুরীকে ব্যথা দিতে তাহার মোটেই সাহস হইত না। কন্‌সার্টের আড্ডা, চায়ের আড্ডা, খেলার আড্ডা, সব বন্ধ হইল। নিয়মিতরূপে সকালে-রাতে পড়িতে হইত। দুপুরে স্কুলে চুপচাপ পড়া শুনিতে হইত— একটু দুষ্টামি করিলেই 'স্যার' মাধুরী-দিদির কাছে রিপোর্ট পাঠাইবেন। কিন্তু এক বন্ধুর দল ছাড়িয়া, সে আর এক বন্ধুর দল লাভ করিল। মাধুরীর বাড়ীতে প্রায়ই তাহার সহপাঠী-বন্ধু মেয়েরা আসিত। বিকেলে চায়ের পার্টি, গানের বৈঠক, সাহিত্য-সভাও হইত। নিমাই মাধুরী-দিদির পারসোন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট হইয়া উঠিল। পার্টির আয়োজন করা, কেক্, বিস্কুট, ফুল কিনিয়া আনা, চেয়ার টেবিল সাজানো, আলো ঠিক করা ইত্যাদি নানা কাজে তাহার বিকেল কাটিত। তারপর মাধুরী-দিদির বন্ধুদের খুচরা জিনিষ কিনিয়া আনা। প্রায়ই তাহাকে হন্-হন্ করিয়া মিউনিসিপ্যাল্ মার্কেটের দিকে ছুটিয়া যাইতে দেখা যাইত। পথে কোনো বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, আরে ভাই, ভারি ব্যস্ত; ভারি দরকার। কোনদিন সে বলিত, এই মিউনিসিপ্যাল্ মার্কেটের দোকানদারগুলো ডাকাত,—ডাকাত। কোনদিন সে বলিত, এই দেখো না, এইটুকু লেশ, তার দাম তিন টাকা,—এইটুকু পশম, এর দাম নিলে বারো আনা। আর খাবারওয়ালাগুলো সব

চোর চোর—পুলিসে দেওয়া উচিত—কাল কেক্ কিনে নিয়ে গেলুম ভাই, বাসি পরশুকার, একটু তাতিয়ে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে, খুন কোরতে পারে, খুন কোরতে পারে—

মাধুরী দিদির বাড়ীতে নিমাই-এর দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়া গেল।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী দিদির শাসনের বিরুদ্ধে নিমাই মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, কিন্তু এই মাধুরীভরা মেয়েটির সহিত পারিয়া উঠিত না, হার মানিতে হইত।

কিন্তু সুখ তো তাহার ভাগ্যে নাই—একস্থানে সে কি করিয়া বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিবে! দিন বেশ কাটিতেছিল, হঠাৎ কোথা হইতে এক বিলাত-ফেরৎ আপদ আসিয়া জুটিল। সে-ই মাধুরী-দিদিকে একেবারে দখল করিয়া বসিল! মাধুরী আর বড় নিমাইএর খোঁজ লয় না; সে কখন বাড়ীতে আসে যায়, কখন খায় না-খায় তাহার খবর রাখে না। মাধুরী দিদির সঙ্গে বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া নাকি লোকটা বিলাত গিয়াছিল। দ্বারে রসনচৌকি বসিল না বটে, কিন্তু নিমাই-এর অন্তর করুণ সুরে ভরিয়া গেল, আকাশে-বাতাসে যেন কোন্ সানাইয়ের বিদায়-রাগিণী বাজিতেছে।

বিবাহের পরদিন নিমাইকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মাধুরী বলিয়াছিল, নিমাই, আমার নূতন বাড়ীতে

গিয়ে তুমি থাক্‌বে—আমার বাড়ী এখন সাজিয়ে গোছাবে কে? নিমাই অশ্রুসিক্ত স্বরে বলিয়াছিল, আমি চলে যাব মাধুরী দি, আর তোমাদের কাছে থাক্‌ব না।

পাগল ছেলে!

মাধুরী তাহার ভাবী স্বামীর সহিত নিমাই-এর ভাব করিয়া দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই পারে নাই। কিন্তু সে যে এমনভাবে চলিয়া যাইবে তাহা ভাবে নাই।

তখন বাংলার কোন জেলায় দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। নিমাই সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করিতে ছুটিল। ইহার পর নিমাইকে বড় কলেজে আর দেখা যাইত না। কলেজের একটা মেসে আশ্রয় লইয়াছিল বটে, কিন্তু খুঁজিলে তাহাকে কখনও পাওয়া যাইত না।

কোথায় দুর্ভিক্ষ—কোথায় বন্যা—কোথায় মহামারী—বাংলা দেশের গ্রামে-গ্রামে সে ঘুরিয়া দেশমাতার সেবা করিয়া বেড়াইত। একটা আস্তানা জুটাইয়া লইতে তাহার বড় বেশী বেগ পাইতে হইত না। দিদি, মাসি, একটা সম্পর্ক পাতাইয়া, কোথাও এক-দিন, কোথাও একমাস, কোথাও এক বছর সে নিশ্চিন্ত মনে কাটাইয়া দিত। মাঝে-মাঝে কলিকাতার কোনও মেসে তাহার দেখা পাওয়া যাইত বটে। সর্ব্বদাই সে ব্যস্ত আর শ্রান্ত। দেখা হইলেই বলিত, ভাই, সর্ব্বনাশ হ'ল—কি কোরছ! সব সর্ব্বনাশ হয়ে গেল,—না খেয়ে, রোগে ভুগে, লোকগুলো যে মারা গেল! তোমরা কি ভেবেছ? কে তোমরা? এই কটা ব্রাহ্মণ কায়স্থ?

জাত যা, সে ত ওই চাষীরা! দেখো দেশের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

কখনও বলিত, চামার, চামার,—পুরুষগুলো হচ্ছে পশুর অধম, কি কোরে রেখেছে মেয়েদের? আহা, আহা!

কখন বলিত, মরে গেল, দেশের ছেলেগুলো সব মরে গেল যে,—একমাস না হতেই যে হাজার হাজার ছেলে মরছে, কি কোরছ?

দেশের সেবা করিয়া ও দেশের দুঃখ দেখিয়া তাহার দিন আগেকার মতই বেশ আনন্দে কাটিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কখনও তাহার মুখে বিষাদ দেখে নাই; সর্ব্বদাই সে চির-প্রফুল্ল। টাকা সে রোজগার করিত না বটে, কাহারও কাছে হাত পাতিয়াও চাহিত না, তবু সে কখনও অর্থের অভাব অনুভব করে নাই। মাঝে-মাঝে অনাহার বা অনিয়মিত সময়ে আহার হইলেও, কখন সে খাবারের জন্য ভাবে নাই। জমিদারের বাড়ীতেই হোক, আর চাষীর ঘরেই হোক, বামুনের রান্নাই হোক, আর মুসলমানের হাঁড়িতেই হোক, আহার ঠিক্ সময়ে আসিয়া জুটিয়াছে। সকল জায়গায় সে সমান তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছে। যখন তাহার একটা জামার দরকার, তখন হয়ত কেহ তাহাকে একটা কাপড় দিয়াছে। যখন তাহার কাপড়ের দরকার, তখন হয়ত কেহ একটা জুতা দিয়াছে। এরূপ লোকের দিবার ভুল মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু প্রায়ই তাহার যখন যা দরকার হইয়াছে তাহা জুটিয়া গিয়াছে।

সে বলিত, বিশ্বরাজের রাজত্বে এই যে সারাদিন খাঁটি, তুমি কি ভাবো, তিনি আমার মাইনেটা নেহাৎ ফাঁকি দেবেন? না হে, সে সর্দ্দার-মজুরটা অত জোচ্চর নন। কি জানো, পৃথিবী-লক্ষ্মী আমার ভাগের একমুঠো চাল যেদিন যার হাঁড়িতে ফেলে দেন, তার বাড়ীতে অন্ন আমার ঠিক জুটবে। আর তিনি যেদিন তাঁর অমৃতময় প্রসাদ দেওয়া বন্ধ করবেন, জগতের সব রাজাগুলোরও শক্তি নেই যে, আমায় কিছু দেয়। এই যে লোকে টাকা দেয়, সে কি জানো? জগতের যিনি খাজাঞ্চী, তিনিই তাঁর ছোট-ছোট চেকগুলো এদের হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে আমার পাওনা শোধ করে দিচ্ছেন। আমি দিন-মজুর, খাটি; আমাকে খাওয়া-পরানোর ভার সর্দ্দারের।

মাধুরী দিদিকে ছাড়িয়া চলিয়া আসার পর প্রায় দশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন হন্ হন্ করিয়া পথে যাইতেছে দেখিয়া হাত দুইটি ধরিলাম, আরে নিমাই যে, কেমন আছ?

ভাই, ভারি ব্যস্ত, ভারি ব্যস্ত।

নিমাই দেখিতে সেই আঠারো বছরের ছেলেটির মতই আছে, শুধু তাহার চোখের কোণে একটু কালি, আর কপালে কয়েকটী রেখা।

আরে খবর কি?

খবর কি ভাই, এতদিন পরে আট্‌কা পড়ে গেছি।

কি রকম ? বিয়ে-থা করলে না কি ?

এখন কি আর ভাই বিয়ে করবার বয়স আছে,—এখন সব বিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

সাম্‌নের এক চায়ের দোকানে দুইজনে ঢুকিয়া বসিলাম।

নিমাই বলিল, ভাই, এতদিন পরে আট্‌কা! এত সব বাঁধন এড়ালুম,—কিন্তু এই সাত বছরের মেয়েটা যা বেঁধেছে ভাই!

আমি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলাম, সে কি হে ?

হাঁ হে, আর বোলো না, পুরুষগুলোর মাথায় ঝাঁটা মারতে ইচ্ছে করে, এই দেখোনা, বাপের একটা মেয়ে, বাপ দশ হাজার টাকা দিয়ে এক ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এস্‌সির সঙ্গে বিয়ে দিলেন। তিনি এখন এক আফিমের দোকান খুলে বসেছেন। আহা মালতীর কথা বলি নি—তার স্বামী বুঝ্‌লে—লোকটা রোজ রাতে একটা-দুটোর সময় মদ খেয়ে বাড়ী ফিরবে, বলবে, জানো আমি একজন ফার্ষ্ট ক্লাস এম্‌-এস্‌সি, আফিমের দোকান করে পাঁচশো টাকা মাসে রোজগার। তা কি একা আসবে, সব বন্ধুদের নিয়ে আসবে, মালতীকে রোজ তাদের মদের চাট রেঁধে রাখতে হবে, লুচি, মাংস। তা সে একটা ঝি রেখেও দেয় নি। বলে, বিয়ে করেছি কি জন্যে, স্ত্রীকে-স্ত্রী, ঝিকে-ঝি, আজকাল যেমন খরচ—ঝি রাখা কি গেরস্থের ঘরে পোষায়! বেচারী একা সারা দুপুর সব বাসন মাজবে, উনুনে আগুন দেবে, সব রেঁধে ঠিক কোরে রাখবে, আর স্বামী-দেবতা রাত-দুপুরে ইয়ার-বন্ধু নিয়ে খেতে আসবেন। এ সমাজ উচ্ছন্ন

যাবে না? বলিতে-বলিতে তাহার মুখ রাগে লাল হইয়া গেল। আমি তাহাকে থামাইয়া বলিলাম, তা আটকা কোথায় পড়েছ ভাই?

হ্যাঁ বলছি, সেই কমলাকে জানো না? তার বাবা আমায় তাড়িয়ে দেন, তা তাঁর দোষ ছিল না ভাই, আমি সত্যিই খারাপ হয়ে যাচ্ছিলুম। সেদিন পথ দিয়ে যাচ্ছি, উপরের জানালা দিয়ে কে ডাক্‌লে। দেখি কমলা। দরজা খুলে দিলে। ভেতরে যেতেই প্রণাম কোরে বল্‌লে, ভারি রোগা হয়ে গেছ নিমাই-দা। কেঁদে ফেল্‌লে ভাই! আমিও জান তো, কেঁদে ফেল্‌লুম। তার ছোট দুটো মেয়ে,—বেশ ঘর-সংসার কোরছে। বল্‌লুম, সুখে আছ তো? বল্লে ত, বেশ আছি। তারপর বল্‌লে, তোমায় পেয়েছি, আর ছাড়ছি না, নিমাই দা, তুমি কিছুদিন আমার কাছে থেকে একটু সেরে যাও। বল্লুম, তা তোর স্বামী কিছু বলবে না। বললে, না। তা সত্যি, ওর স্বামী খুব ভাল লোক। ওকে বলা-কওয়াতে তবু ছেড়ে দিতে চাইলে, ওর স্বামী এসে ত ছাড়তেই চান না। আমার নামটা ভাই শুনেই বুকে জড়িয়ে ধরলে, বল্লে, আমি যা দেশের কাজ করেছি। হাসিও এল! আমিও দেশের কাজ করছি? আরে এ কি দেশের কাজ? যাক্, সেইখানেই ত আট্‌কা পড়ে গেছি। কি জানিস্ ভাই, ঐ কমলার বড় আর ছোট মেয়ে দুটো 'নিমাইমামা' বলেছে, আর কি,—একেবারে ঘর ছেড়ে বেরুবার যো নেই। আচ্ছা দেখ্ দেখি, কি করি, ওই মালতীর স্বামীর সঙ্গে একদিন ঘুষোঘুষিই হয়ে যাবে। কি জানিস্ নেহাৎ

মেয়েটা বিধবা হবে—না হ'লে সেদিন ওকে মেরে নর্দ্দমায় পুঁতেই ফেলতুম। যাক্ ভাই, ভারি ব্যস্ত।

তোমার ব্যস্ততা আর গেল না—তা মাধুরী-দিদির খবর কি ?

মাধুরী-দিদি ?—গেছলুম ভাই, দেখা কোরতে। কি জানিস্ স্বামীটা এ্যারিষ্টোক্রাট্! ওই মাঝে মাঝে যে যাই, পছন্দ করে না। সব ছোট মন ; বিলেত ঘুরে এলে কি হয় ? কি দরকার অশান্তি বাড়িয়ে ? দিদি তো কত যেতেই বলে, না গিয়ে আর থাক্‌তে পারি না, মাঝে-মাঝে যাই, না ভাই সন্দেহে আর নেই।

রাত প্রায় নটা হইবে। বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিতেছে, বজ্র হাঁকিতেছে। কি একটা রূপকথা শুনিতে শুনিতে কমলার দুটি মেয়ে খোলা বইয়ে মাথা রাখিয়া শ্লেট বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তক্তার ওপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর মাষ্টার মহাশয়ও ইজি-চেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে-মাঝে ঝোড়ো-হাওয়া দরজা জানালা-গুলো ধাক্কা দিতেছে। কে যেন সজাগ বাতাসে হাহা করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। নিমাই স্বপ্নে শুনিতেছিল, ঘস্ ঘস্—অবিশ্রাম কে ছাই ও ঝামা লইয়া বাসন মাজিতেছে, পোড়া কড়া ঘষিতেছে, তারপর হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করিয়া সব বাসন যেন পড়িয়া গেল, ভাঁড়ার-ঘরের মসলার টিনগুলা কে কাহার ঘাড়ে পড়িয়া চারিদিকে মসলা ছড়াইয়া গেল ; তার পরে কে মাতালের মত চীৎকার করিয়া

কাহার চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—সে স্পষ্ট কিছু দেখিতেছিল না, স্বপ্নে যেন সব শুনিতেছিল।

বাহিরে ঝড়ের শব্দ বাড়িয়া উঠিতেছিল। কান্নার উদাস স্বর নয়; ঝোড়ো-হাওয়ায় কে যেন ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। নিমাই বার-বার চমকিয়া উঠিল। পূর্ব্বের স্বপ্ন মিশাইয়া গেল। আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া দেখিতে লাগিল, কোন্ জলসিক্ত বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ নিরন্ধ্র অন্ধকারে সে পথ খুঁজিয়া-খুঁজিয়া ফিরিতেছে; কিছুতেই রাস্তা পাইতেছে না। সহসা সে কোথায় দাঁড়াইল; মুষ্টিবদ্ধ হস্তে কি এক কঠিন বস্তুর উপর ক্রোধের সহিত বার-বার আঘাত করিতেছে; ঘুষি ছুঁড়িল, লাথি মারিল, দরজা কই খোলে না। ঘুমের ঘোরে চেঁচাইয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

ধীরে কমলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। এই নিদ্রিতদিগের দিকে চাহিয়া তাহার চোখে জল ভরিয়া আসিল। আবেগের সহিত ঘুমন্ত দুই মেয়েকে স্নেহ-চুম্বন করিয়া নিমাই-এর দিকে চাহিল; ধীরে চেয়ারের পাশে আসিয়া ডাকিল, নিমাইদা।

নিমাই ধীরে চোখ মেলিল, বিস্মিত হইয়া চাহিল। আবার ভালো করিয়া চোখ রগড়াইয়া দেখিল, মুখে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল; তাহার মনে হইল সে যেন একটা মস্ত বড় স্বপ্ন দেখিতেছিল। সেই যে ষোল বৎসর পূর্ব্বে এক বৈশাখী-ঝড়ের অন্ধকার-সন্ধ্যায় এই মেয়েটি তাহাকে ঘরে ডাকিয়া লইয়াছিল, তাহার পর সে যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; জীবনের এতগুলি বৎসরের ঘটনা যেন স্বপ্নে ঘটিয়াছে। তাহাই যদি সত্য হইত, সে ও কমলা যদি সেই কিশোর-

কিশোরীই থাকিত, তবে কমলাকে পাওয়ার পর জীবনে সে যে সব ভুল করিয়াছিল, তাহা আর হয় ত করিত না। স্নিগ্ধ চোখে কমলার দিকে চাহিল।

ম্লান হাসিয়া কমলা বলিল, খুকিরা খেয়েছে, চলো খেতে যাই।

কিন্তু আট্‌কা সে থাকিতে পারিল না। কোথাও বাধা থাকা তাহার ভাগ্যে যে সহে না। এক সন্ধ্যা-বেলায়, একটু বেড়িয়ে আসি বলিয়া সে কমলা ও তাহার ছোট মেয়ে দুইটিকে ছাড়িয়া মাতা ধরণীর বুকে কোন্ নূতন পরিচয়ের সন্ধানে চলিয়া গেল।

এখন সে কোথায় আছে জানি না; মাঝে-মাঝে উল্কার মত কলিকাতায় আসে; খেয়াল ও সময় হইলে কমলা, মাধুরী-দিদি ও অন্য সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখাও করে। এবার এসে ঠিক্ থাক্‌ব, বলিয়া আশ্বাস দিয়া আবার কোথায় চলিয়া যায়। সর্ব্বদাই সে ব্যস্ত, আর পরিশ্রান্ত। লক্ষ্মী, কমলা, মাধুরী-দিদি, মাধুরী-দিদির বন্ধুদল—ইহাদের ফরমাস্ আর খাটিতে হয় না বটে, কিন্তু এখন যে সমস্ত দেশের ফরমাস্ খাটিয়া তাহাকে ঘুরিতে হয়। বাংলার গ্রামে-গ্রামে ফরমাস্ খাটিবার যাহাদের কেহই নাই, সেই দুঃখীদের ফরমাস্ খাটিয়াই হয় ত তাহার সমস্ত জীবন কাটিবে। কাজের ব্যস্ততায় প্রাণের আবেগে খেয়ালই থাকিবে না, কালো চুল সাদা হইয়া যাইতেছে, চোখের জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইতেছে, মৃত্যুর পরোয়ানা শীঘ্রই আসিবে।

তারপরে একদিন হয় ত কোন নগণ্য গ্রামে ক্ষুদ্র নদীতীরে গরীব চাষীদের জীর্ণ-কুটীরের সম্মুখে কোন শরৎ-সন্ধ্যায় পৃথিবী-মাতার শ্রান্তিহরা ক্রোড়ে শান্ত হইয়া শুইয়া হাস্য-মুখেই সে মরিবে, তাহার কথা কেহ জানিতেই পারিবে না। শুধু কেবল কয়েকটি চাষী-মজুর যুবক মলিনমুখে তাহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবে, কয়েকটি গ্রামের বধূ নদীর ঘাটে বসিয়া অশ্রু জল ফেলিবে, কয়েকটি পল্লী-বিধবা চিতা-ধূমের দিকে চাহিয়া চোখের জল কিছুতেই রাখিতে পারিবে না ; আর গ্রামের যে ছোট ছেলে-মেয়েরা সারাদিন খেলা ভুলিয়া নদীতীরে আসিয়া জমিয়াছিল, রাতে তাহাদের বারবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর হয় ত লক্ষ্মী, কমলা, মাধুরীর কাছে এ মৃত্যুর খবর কোনদিন পৌঁছিবে না ; নিমাই যে আসিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়াছিল, সেই আশায় তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া
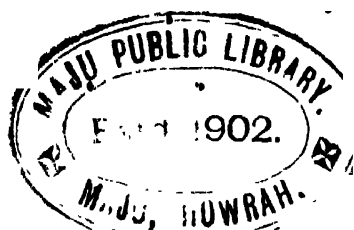
বিকাশের ডায়েরি

ল'কলেজে বিকাশ ছিল আমার বিশেষ বন্ধু। দেখতে কালো, লম্বা, সুপুরুষ বলা চলে না। কিন্তু তার মুখে এমন তারুণ্য, ব্যবহারে এমন সৌজন্য ও চিন্তার এমন গভীরতা ছিল যে, তাকে আমার ভাল লাগত। তার মানসপ্রকৃতি যেমন কল্পনাপ্রবল তেমন সত্যনিষ্ঠ ছিল।

বিকাশের সহিত তাহারি সমবয়স্কা এক বিবাহিতা যুবতীর বিশেষ পরিচয় ছিল। সাধারণ ভাষায় মনের এই গভীর যোগকে ভালবাসা বলা যেতে পারে। দু'জনেই কলিকাতায় থাকলেও তাদের দেখা হত কম, পত্র ব্যবহার চলত। বিকাশ তার আত্মার আত্মীয়াকে অনেক চিঠিই লিখেছিল, কিন্তু অধিকাংশই পোষ্ট করে নি। সে চিঠিগুলি তার ডায়েরিতে লেখা রয়েছে।

আজ বিকাশ ভারত-গভর্ণমেণ্টের আফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। আফিসের অগণিত চিঠি লেখা, হিসাব রাখা, বড় বড় ফাইল ক্লিয়ার করা ছাড়া জীবনে তার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। তার বিগত যৌবনে ডায়েরিতে লেখা চিঠিগুলি পড়ে সে কখনও কল্পনা করতে পারবে না যে, এই চিঠিগুলি সে কোন দিন,

নিজে লিখেছিল। এই ভরসায় বিকাশের ডায়েরি হতে কয়েক খানি পাতা ছাপতে দিলুম।

একটি যুবককে একটি তরুণী কেন ভালবাসে, তা কে বলতে পারে! সাধারণ লোকে যুবকটির মধ্যে কোন অসামান্যতা দেখে না। কিন্তু ওই সুন্দরী তরুণী যুবকের আত্মার কোন সুন্দর রূপ দেখেছে, সে মুগ্ধ হল। ভালবাসা একটা রহস্য, বোঝার চেয়ে না-বোঝার অংশই অধিক। মানুষ যদি মানুষকে বিবেচনা করে ভালবাসত বা ভালবাসার যোগ্য ভেবে ভালবাসত, তাহলে এ পৃথিবীতে ক'জন পেত এ অমৃতের স্বাদ। তুমি যে আমায় ভালবাস, একথা,যেন আমি বুঝতে, বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা না করি।

ব্রাউনিং-এর এ কবিতাটি আমার বড় ভাল লাগে।

Room after Room.

I hunt the house through

We inhabit together.

কাল সন্ধ্যায় তুমি বাড়ী ছিলে না। কিন্তু ঘরের পর ঘর তোমার সন্ধানে ঘুরতে বড় ভাল লাগল। শূন্য ঘরের পর ঘর খুঁজছি,

কোথায় তুমি ? আলনাতে শাড়ী ব্লাউজ সাজান, ডেস্কিং টেবিলের একটা ড্রয়ার খোলা, মেজেতে একটা ছেঁড়া চিঠি পড়ে, সন্ধ্যার রঙীন আলো ঘরের নীল দেওয়ালে, তুমি নেই। ভাড়ার ঘর বন্ধ, বেড়ালটা দরজার গোড়ার ঝিমোচ্ছে, বারান্দার আলসাতে বাঁধা বাসাতে পাখীরা কিচির মিচির করছে, রান্নাঘরের আগুন নিভে গেছে, পশ্চিমাকাশ রাঙা হয়ে উঠল, তুমি নেই। ছাদের কোণে বেতের মোড়ায় চুপ করে বসলুম, নারিকেল গাছগুলির আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার বাতাসে করবীফুলের ঝাড় দুলে উঠেছে, একে একে তারা ফুটে উঠল, তুমি নেই।

Jealousyকে জয় করতে হবে। সেটা হচ্ছে প্রেমের অন্তরায়। ঈর্ষ্যাকে যারা বলেছে প্রেমের উল্টো দিক বা তার প্রতিক্রিয়া, তারা ভুল বলেছে, আসল প্রেমকে তারা জানে নি। একথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, তোমার ওপর আমার কোন অধিকার, দাবী নেই। প্রেমের রাজ্যে প্রত্যেকে স্বরাট। যদি তোমাকে পাই, যেন স্ব-ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের আনন্দে পাই, সে পাওয়াকে একমাত্র আমার অধিকার বলে মনে না করি। জীবনকে নানা জনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। প্রতিজনের সঙ্গে যে সম্পর্ক হয়, তা বিশেষ সম্পর্ক। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, এই আত্মার যোগ সবিশেষ, ইংরাজীতে যাকে বলা যায় unique, তার

তুলনা নেই পৃথিবীতে। এই বিশেষ সম্পর্কের গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে যদি তুমি তৃপ্ত হও ত ভাল। তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার আমার কি অধিকার আছে। ভালবাসার দোহাই দিয়ে লোকে কর্তৃত্ব করতে চায়। প্রেম স্বাধীন থাকলেই এক জীবনের স্পর্শে আর এক জীবন নবজন্ম লাভ করে, ফুটে ওঠে গানের ফুল, জ্বলে আনন্দের প্রদীপ, ভাবের সূতায় কথার মালা গাঁথা হয়। নূতন সৃষ্টির রহস্য।

তারপর ছাড়াছাড়ি হয়। দুই জীবনধারা চলে যায় ভিন্ন স্রোতে, অন্য পথে। কিন্তু তাদের যে মিলন হয়েছিল, দিন কেটেছিল পাশাপাশি, রাত একই তারালোকের নীচে, এই আনন্দ-সুর বাজে প্রভাতের জাগরণে, সন্ধ্যার বিজন উদাসতায়, রাত্রির নিদ্রাহারা প্রহর ভরে।

এসব কথা তুমি বুঝবে কিনা জানিনা। নাই বা বুঝলে, তাতে ক্ষতি নাই। তুমি যদি না অন্তরে অনুভব করে থাক, তা হলে কথা দিয়ে আমি তোমায় কি বোঝাতে পারব? আমার মনে হয়, কথা মনের ভাব প্রকাশ করে না, আড়াল সৃষ্টি করে,—নানা অর্থের মিথ্যা বোঝার আড়াল।

অতি নিকটে নয়, অতি দূরেও নয়, তুমি শুধু কাছাকাছি থাক। যেন কর্মের মধ্যে ক্লান্তি লাগলে চোখ মেলেই তোমায় দেখতে পাই, যেন চিন্তায় চিত্তে অবসাদ হলে তোমার স্নিগ্ধ দৃষ্টিলাভ করি।

নিবিড় যে আলিঙ্গন, তাতে ক্ষণিকের জন্য তীব্র আনন্দানুভূতি কিন্তু তারপর ব্যথা জাগে। আনন্দকে ত অনন্তকাল ধরে সঞ্চারিত করা যায় না।

দূরে যদি যাও, কাজ থেকে মন চলে যায়, স্মৃতির চিত্রশালায় পথ হারিয়ে ভুলে আনমনা বেলা কাটে। কাছে যদি থাক, কাজ করবার শক্তি পাই। হয়ত তোমার পায়ের ধ্বনি পাশের ঘরে, আলমারি গোছাচ্ছ, টেবিল সাজাচ্ছ।

আজ বিকেলে ভেবেছিলুম, তুমি আসবে। সব কাজ ফেলে একা বসেছিলুম, বন্ধুদের দিয়েছিলুম বিদায় করে, যাদের আসবার কথা ছিল বারণ করে দিয়েছিলুম, যারা নিমন্ত্রণ করেছিল, বলেছিলুম আজ আমার সময় নেই।

তুমি এলে না। কে তোমায় চায়ে নিমন্ত্রণ করেছে, সেখানে গেলে।

এই না-আসার মধ্যে আজ তোমাকে নূতন করে পেলুম। ভুল বুঝোনা। আমরা যা পাই, তার দাম ত আমরা সব সময় দিই না, তার মূল্যও জানি না। তোমাকে আজ সন্ধ্যায় না-পাওয়ার মধ্যে তোমাকে পাওয়ার মূল্য বুঝেছি।

বাইরে সন্ধ্যা। ঘরে ইজি চেয়ারে চুপ করে বসে। সূর্য্যাস্তের বর্ণোৎসব দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আলস্যে আর ওঠা হচ্ছে না। প্রদোষের ক্রমান্ধকারমান ঘরটি বড় রহস্যময় অপূর্ব্ব। স্কাই-লাইটের কাঁচের ওপর আলো যেন ঘুম পাওয়া ছেলের ক্লান্ত চাউনি। হলদে দেয়ালের ওপর অস্পষ্ট আলোকে কি কাতরতা-ভরা, ছবিগুলি চেয়ার,

টেবিল সব আবছায়াময়। সবচেয়ে বিচিত্র লাগছে ওই বড় কালো পিয়ানোটা, ওটার মধ্যে কত সুর ঘুমিয়ে আছে, ও যেন কোন রূপকথার দৈত্য গুঁড়ি মেরে বসে আছে চুপ করে, আঙ্গুলের ইসারায় আদেশ করলেই সঙ্গীতের অমৃতলোকে নিয়ে যাবে। ও কিন্তু আমার হুকুম মানতে চায় না, তোমার অঙ্গুলিগুলির বড় বাধ্য।

ছবিগুলি দেওয়ালের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গেছে। মধুর স্তব্ধতা, গভীর শান্তি। জালনার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নারিকেল বৃক্ষগুলির উপর তৃতীয়ার চন্দ্র।

চুপ্ করে বসে আছি। তুমি এসে জ্বালবে আলো, পিয়ানোতে সঙ্গীত জেগে উঠ্‌বে প্রভাতী পাখীর আনন্দ ঝঙ্কারের মত।

তুমি এলে না, আমাকে আলো জ্বাল্‌তে হল। ইলেক্‌ট্রিকের আলো বড় তীব্র, অস্বাভাবিক, দিনের আলোর সঙ্গে তার কত তফাৎ। তার মধ্যে মিড় নেই, একটানা সুর, এ আলো জিনিষকে দেখায় কিন্তু উদ্ভাসিত করে না। বারান্দার অন্ধকারে এসে বস্‌লুম।

আমার এ চিঠি তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌লে? যদি কোন মধুর সন্ধ্যায় আবছায়াময় ঘরে মায়াময় আলো-অন্ধকারে বসে প্রতীক্ষা করে থাক, তবেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

কথা আমাদের অনুভূতিকে কতটুকুই বা ব্যক্ত কর্‌তে পারে। সাদা কাগজ ও পেন্সিল, এই হচ্ছে আমার হাতের যন্ত্র, শিল্পীর যেমন পট ও রঙের তুলিকা। সাদা কাগজের ওপর কালো আঁচড় টেনে চলেছি। শূন্য সাদা কাগজের ওপর পেন্সিলটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

থাকে। মন বলে, লেখ, লেখ। পেন্সিল কয়েকটি আঁচড় টানে, কথার পর কথা, তারপর কালো দাগগুলির পাশে সম্মুখের দীর্ঘ সাদা পথের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়। মন ভাবে, যা বল্‌তে চাই তা ত লিখ্‌তে পার্‌ছি না। তেম্নি স্তব্ধ হয়ে আমি চেয়ে আছি রাতের অন্ধকারের দিকে, অনন্ত নীলাকাশের শুভ্র নীহারিকা-পথের দিকে।

শিল্পীদের সৃষ্টির প্রেরণার মধ্যে একটা গভীর বেদনা আছে, মনে হয়। তাঁদের Inspired মুহূর্ত্তগুলি কোন মর্ম্মগত বেদনার মগ্নচৈতন্যলোকের প্রতিক্রিয়া। বিটোফেনের সোনাটা, শেলীর কবিতা মানবের চিরন্তন বেদনা হতে উৎসারিত। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, বিশ্ব সৃষ্টির মূলগত প্রেরণা আনন্দ হতে। সে আনন্দ কেমন জানি না, কিন্তু সৃষ্টির মর্ম্মে যে বেদনা আছে, তা অনুভব কর্‌ছি।

পেয়েও যে পাওয়া যায় না, কোথায় ব্যথা থাকে, দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। মন ভাবে, এ পাওয়া ক্ষণিক, এইখানেই হয়ত শেষ।

আজ বিশ্বপ্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে যে আনন্দের শিহরণ, জাগরণের আলোড়ন, সে আনন্দ আমাদের অন্তরে পরিব্যাপ্ত হোক। খোল, খোল দ্বার, বসন্ত-স্পন্দিত পৃথিবীর পুষ্পিত অঙ্গনে এস। চেয়ে দেখেছ কি, আকাশে আজ কিসের রং লেগেছে, গাছে গাছে রঙীন

ফুলের ভাঁয় ধরে না, পুষ্পসুরভিময় বাতাসে জ্যোতির্ম্ময় আলোক-ধারায় কি আনন্দময় প্রাণস্রোত প্রবাহিত।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই ত এ আনন্দস্রোতে মগ্ন হওয়া যায় না, নানা ক্ষুদ্রতা, বিরুদ্ধতায় জীবন খণ্ডিত। তাদের যদি না জয় করতে পারি, আজকে তাদের যেন শান্ত করতে পারি।

তোমার মন আমি জানতে চাই না। মনের কথা কে জানতে পারে? তুমি একদিন আমায় বলেছিলে, দেখতে ইচ্ছে করে তোমার মন। আমি বলেছিলুম, ভয় পাবে, সেখানে যে স্বর্গ ও নরক পাশাপাশি, সেখানে স্বর্গের পারিজাত ফোটে, সয়তানের চক্রান্ত হয়। মন জেনে দরকার নেই।

তোমার কথা ভাবতে বসলে আমার মন বদলে যায়, আমার সত্তার অপরূপ পরিবর্ত্তন হয়। প্রতিদিনকার সহজ যে মানুষ, সে মানুষ আর থাকি না। যে মানুষ আজ চাকরকে বকেছি, ধোপার টাকা কেটেছি কাপড় হারানোর জন্য, সে মানুষ যেন লজ্জিত হয়ে পালাতে পারলে বাঁচে; আমার মধ্যে আর এক মহান অচেনা মানুষ জাগে, সে তার সব সঞ্চয় উজাড় করে দিতে চায়, কোন মহৎ দুঃসাহসিক কাজে আত্মোৎসর্গ করতে চায়।

কিন্তু প্রেমের জন্য ত্যাগ করা অর্থাৎ আপনাকে জীবনের সহজ সরল সুখ হতে বঞ্চিত রাখা, দেহমনকে বুভুক্ষু রাখা, আমি বড় বলি

না। না-পাওয়ার বেদনা, আরও না-পাওয়া দিয়ে শান্ত হয় না। প্রেমের ত্যাগ হবে মিলনসমুদ্রের আনন্দোচ্ছ্বাস।

এ কথা তোমায় লিখেছি যে, jealousyকে জয় করতে হবে। কিন্তু সে ত সহজ নয়। আমাদের মনের মধ্যে যে ওথেলো আছে, সে সভ্য হয়ে উঠেছে। এখন তার ঈর্ষ্যা হত্যায় মূর্ত্তিলাভ করে না, এখন সে তার ব্যথাকে পাঠিয়ে দেয় মনের মগ্নচৈতন্যলোকে, কিন্তু সেখানে সে বেদনা চুপ্ করে বসে থাকে না, রহস্যময় অজ্ঞাত তার ক্রিয়া, হয়ত একদিন হঠাৎ সে জেগে উঠবে, তার সঞ্চিত শক্তি প্রকাশিত হবে মনের দারুণ ভূমিকম্পে। সেইজন্যে বল্‌ছি তুমি কার সঙ্গে নূতন বন্ধুত্ব কর্‌ছ, সে কথা আমায় লিখ না। তোমার মনের অপূর্ব্ব সুন্দর স্বচ্ছতা আছে, আমার মনের জানলা তোমার দিকে পূর্ণভাবে খুলে দিতে পারি, তোমার নির্ম্মল চোখের আলোয় যা দেখবে তা অতি সহজ সরলভাবে দেখবে। কিন্তু আমার চোখে রয়েছে রঙীন মায়া, আমার মন রহস্যঘন, সেজন্য তোমার মনের সকল কথা আমি জান্‌তে চাই না।

অজন্তার পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব দেখেছ? অজন্তায়ত তুমি যাওনি, কিন্তু ছবিতে নিশ্চয় দেখেছ। অনিন্দ্যকান্তি দিব্য জ্যোতির্ম্মান ভগবান বুদ্ধদেবের পার্শ্বে এক কৃষ্ণা রাজকুমারী দাঁড়িয়ে আছে, ভুসার মত কালো দেহ, স্বল্পবস্ত্রপরিহিতা, পদ্মাক্ষী, ক্লান্ত মুখ করুণ বিহ্বলতায় ভরা। সে ব্যথিতা নারী লীলাকমল হাতে এসেছে শান্তির আশায়। এই শান্তি-তৃষিতা কৃষ্ণা রাজকুমারী আমার আত্মার রূপ। কে তাকে শান্তি দেবে? তার দীর্ঘ অক্ষি-পল্লবঘন

নয়নের দৃষ্টিতে যে জীবনের কাতরতা রয়েছে, সে কাতরতা তুমি বুঝ্‌বে কি ?

আর্ট সুখের বা সুখের জন্য হতে পারে, এ আমি ভাব্‌তে পারি না। আর্ট হচ্ছে আমাদের অন্তরের গভীর আবেগের প্রকাশ। সে আবেগ সুখের নয়। সুখ আত্মাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে না। দুঃখ আমাদের সত্তার মর্ম্মস্থলে নাড়া দেয়। এই মর্ম্মের শতদলে বাণী অধিষ্ঠিতা। সেজন্য দেখ্‌বে, জগতের সব বড় উপন্যাস, নাট্য, কবিতা হচ্ছে ট্রাজিডির। তাদের উৎস মানব-জীবনের দুঃখের গভীর অনুভূতিতে।

আমার জীবন আমার কাছে শিল্পের মত। তুমি যে মাঝে মাঝে আমাকে দুঃখ দেও, তা ব্যর্থ হয় না। জীবন-শিল্পের অপূর্ব্ব সৃজন ক্রিয়া চলে।

সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত সকল আর্টের value সম্বন্ধে আমাদের চেতনা সজাগ নয়। কিন্তু আর্টের প্রভাব আমাদের জীবনে থেকে যায়। একখানা ছবি দেখার, গান শোনার বা বই পড়ার আগের ও পরের আমি এক নই। তা যদি হয়, তাহলে বৃথাই ছবি দেখ্‌লুম, গান শুনলুম,বই পড়লুম। শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের আর্ট আমার জীবনকেও গড়ে তুলেছে। তোমাকে আমি আর্টের এক অপরূপ সৃষ্টিরূপে দেখি, তোমার মধ্যে ছবি, গান, গল্প, নৃত্য, ভাস্কর্য্য সকল যেন রূপ

ও কথায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্ছে বিকাশমান পদ্মের মত। কথাটা তোমাকে বোঝাতে পার্লুম কি না জানি না। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ে আমার সত্তা প্রতিদিন নবরূপে গড়ে উঠেছে। পণ্ডিতদের aesthetics গ্রন্থে আর্টে সৌন্দর্য্য স্বষ্টির মূলসূত্র খুঁজ্তে গেছলুম, সে মূলসূত্রের রূপ দেখ্লুম তোমার মধ্যে। এ আমার নব দৃষ্টিলাভ।

তুমি বল্বে, আমাকে এ দৃষ্টিতে দেখ না, এ আমি চাই না; আমি সহজ রক্তমাংসের নারী, ভাবের কুয়াসায় তাকে ঝাপসা ক'রে এমন মানসী মূর্ত্তি গড়া কেন? কেন মূর্ত্তি গড়ি, তা তুমি জান।

তোমার ছোট চিঠিখানি পেলুম। বড় সুন্দর তোমার রূপ দেখ্লুম। প্রভাতে স্নান ক'রে তুমি চিঠি লিখ্তে ব'সেছ, ভেজা কালো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, রক্তকরবী রঙের জামার উপর কালো চুল ঝিক্মিক্ কর্ছে; সত্যস্নান-স্নিগ্ধ মুখখানি, চোখে একটু উদাসভাব। চেয়ারে বসে লেখনি, চেয়ার টেবিল নেহাৎ আফিসেব গন্ধ-ভরা। সোফায় ব'সে লিখে চলেছ। এ্যম্বর রঙের ফাউণ্টেনপেন দিয়ে হাল্কা নীল কাগজে কালো আঁচড় কেটে চলেছ মনের খুসীতে, সোনার নিব দিয়ে কাজলের মত কালো কালি ঝরে পড়্ছে, তোমার চোখ একটু জ্বলজ্বল কর্ছে কি!

রৌদ্রভরা উদাস মধ্যদিনে তপ্ত বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে তোমার এই মূর্ত্তিটি ভেবে তৃপ্তি হচ্ছে।

আজ রাতে চাঁদের রূপ গেছে বদ্‌লে! নীলকান্তমণির পেয়ালা উপ্‌চে পড়্‌ছিল চাঁদের আলো শ্যাম্পেনের ফেনার মত। আজ চাঁদের চোখে করুণ দৃষ্টি। আজ সে আমারি মত বিরহী।

রাত গভীর হল। এতক্ষণ এমিয়েলের জার্ণাল পড়্‌ছিলুম। এমিয়েল লিখছেন, জীবনে একটি মাত্র জিনিষ দরকার, ঈশ্বরকে পাওয়া। আমি বল্‌ব, প্রেমকে পাওয়া।

ছোট বেলা হতে প্রেমকে খুঁজে বেড়াচ্ছি পৃথিবীর বক্র দুর্গম পথে পথে জীবনের প্রদীপ জ্বালিয়ে। সে প্রদীপ নিভিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। স্তব্ধ অনন্ত আকাশের তলায় তারার আলোয় একাকী দাঁড়ালুম। চোখে জল এল। গভীর বেদনায় অনুভব করলুম, আমার অন্তরে রয়েছে তোমার প্রেম, সেখানে প্রেম ও ঈশ্বর এক হয়ে গেছে।

আয়না

কলিকাতার এক বনেদী পাড়ায় অতি পুরাতন জীর্ণ প্রাসাদ। এই ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা প্রাচীন কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ধনী বনেদী বংশের বসতবাটী ছিল। বনেদী পরিবারে ভাঙন ধ'রল—ভায়ে ভায়ে মামলা, পাওনাদারদের নালিশ, মর্টগেজ, রিসিভার, প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল—শেষে এ বৃহৎ বাড়ী হাইকোর্টের নিলামে বিক্রি হ'ল, এক ধনী মাড়োয়ারী বাড়ীখানা কিন্‌লে। সে তাতে বাস কর্‌লে না। বড়বাজারে তার কাপড়ের দোকানের উপর চারতলার খুপরি ঘর ছেড়ে এলে রাতে তার ঘুম হবে না।

মাড়োয়ারীটি তিনমহল বাড়ীখানা কিনে তিনভাগে ভাগ করলে; নানা দিকে বিভাগ-দেওয়াল তুলে, কোথাও দরজা ফুটিয়ে, কোথাও জানালা বন্ধ ক'রে বাড়ীটি এক গোলক-ধাঁধা তৈরী করলে। প্রথম অংশে আস্তাবল, দরওয়ানদের ঘর ইত্যাদি হ'ল চালের ও কাপড়ের গুদাম; যেখানে সরকারদের তেজী সুন্দর ঘোড়ারা নাল-বাঁধান পায়ের খট্‌খট্ শব্দে জুড়ি-গাড়ী টেনে ছুটে যেত, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী প'রে সরকারদের মেজবাবু রাশ ধ'রে বস্‌তেন, সেখানে রেঙ্গুন-চালের বস্তা ও জাপানী কাপড়ের

গাঁট থাব্‌ড়ার জায়গা হ'ল। দ্বিতীয় অংশ, দোতলা বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, নাচ-ঘরে এল প্রেস। হরিলাল নামে এক ভদ্রলোক এই অংশ ভাড়া নিয়ে তার খালধারের টিনের ঘরের পনের-বচ্ছর-পুরানো প্রেসটা তুলে আন্‌লে। থাকোহরি নামে এক ভদ্রলোক তৃতীয় অংশ ভাড়া নিয়ে মেস ও হোটেলখানা খুল্‌লে। অন্দরের যে দরজা দিয়ে সরকারদের গিন্নীরা, বধূরা জড়োয়া-গয়না প'রে পর্দ্দার আড়ালে পাল্কীতে উঠতেন, সে-দরজার উপর থাকোহরি লম্বা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলে, "হিন্দু ভদ্রলোকদের আহারের স্থান"। দরজার দু'পাশে দুই লম্বা সাইন বোর্ড আঁটা—"কাত্যায়নী হোটেল"—ভাত এক থালা –/০, মাছ –/০, আলু ভাজা—০৫ ইত্যাদি; অর্ডার দিলে মাংসের চপ্‌-কাট্‌লেট্‌ পাওয়া যায়।

হরিলালের প্রেস খুব বড় নয়। ঠাকুর-দালানে ছাপবার যন্ত্র ব'স্‌ল, জার্ম্মান প্রেস; পূর্ব্বে সেখানে প্রতি বছর সরকারদের দুর্গা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা হ'ত। তার দু'ধারে লম্বা বারান্দা কাচ দিয়ে ঘিরে টাইপ-বোর্ড, কম্পোজিটারদের কাজ করার জায়গা হ'ল, আর বৈঠকখানায় অফিস।

দোতলার বড় নাচ-ঘরটা হরিলাল তার শোবার ঘর করল। এক সময় সে-ঘরে ঝাড়-লণ্ঠনের প্রদীপ্ত আলোয় পারস্যের কার্পেটের ওপর আমীর খাঁ শরদ বীণ বাজিয়েছে, কাশী-লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধা বাইজীর নৃত্য-গীত হয়েছে, ম্যাক্‌লীন কোম্পানীর বড় সাহেব, মেজ সাহেব হুইস্কি খেতে খেতে সে গান-বাজনা শুনে বলেছে, কেয়াবাৎ! সে ষাট বছর পূর্ব্বের কথা।

রিসিভারের হাতে বাড়ীখানি ছিল তিন বছর, কোন মেরামত হয় নি; মাড়োয়ারীটিও এ জীর্ণ-বাড়ী সংস্কার ক'রে কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে নারাজ, হরিলালের ঘরের দেওয়ালে বালি খ'সে পড়েছে, কোণে কোণে ঝুল জমেছে, মেঝের সিমেণ্ট উঠে গিয়ে নানা জায়গায় গর্ত্ত হয়েছে। তার জন্যে হরিলালের কোন দুঃখ বা আপত্তি নেই। সে তার পিতার আমলের পুরানো বড় খাটটা ঘরের এক কোণে রাখ্‌লে; বেতের ইজি-চেয়ার, ময়লা ক্যানভাসের ডেক্-চেয়ার ও দু'খানা চেয়ার রইল দেওয়াল ঘেঁসে; তা ছাড়া একটা টুল ও একটি ড্রেসিং-টেবিল। বৃহৎ ভাঙা ঘরে এই আসবাব-পত্র এক কোণে, বাকী ঘর খাঁ খাঁ করতে লাগ্‌ল।

দোতলায় আরো তিনখানি মাঝারি ঘর, সেগুলি প্রায় শূন্য প'ড়ে রইল। কারণ, হরিলাল অবিবাহিত, একা থাকে। তার এক ভুটিয়া চাকর আছে, সে হরিলালের দেখা-শোনা করে।

দেখা-শোনা তাকে বিশেষ কিছু করতে হয় না। সকাল বেলা চা, দুপুরে ভাত ও একটা মাছের তরকারি রেঁধে দেয়; রাতে প্রায়ই থাকোহরির হোটেল থেকে ঝাল-মাংস ও রুটি আসে। রাতে হরিলালের আসল আহার হচ্ছে হুইস্কি, রুটি-মাংস অনুপান মাত্র।

হরিলালের জীবন রহস্যাবৃত; জীবনের পূর্ব্বভাগের ইতিহাস কেউ বিশেষ জানে না। কেহ বলে, সে বি-এ পাশ, এম-এ পড়তে পড়তে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। কেন সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়, তারও একটা গল্প শুনা যায়। সেই চিরপুরাতন গল্পের পুনরাবৃত্তি।

হরিলাল ব্যর্থ প্রেমিক, পাড়ার কোন মেয়েকে সে ভালবাস্‌ত, সে মেয়ে তার স্বজাতি নয়, সে ছিল এক ধনীর কন্যা।

সন্ন্যাস-জীবনের নেশা যখন কেটে গেল, দেশে ফিরে এসে হরিলাল দেখ্‌লে, তার বাবা-মা সব মারা গেছেন ; কোন আত্মীয় স্বজনের সন্ধান পেল না। তার একমাত্র বোন ছিল, তার বিয়ে পশ্চিমের কোন সহরে হয়েছে। বোনের কোন খোঁজ-খবর কর্‌লে না। কিছুদিন চাকরির উমেদারিতে অফিসে অফিসে ঘুর্‌ল ; তারপর বিরক্ত হয়ে এক প্রেসের কম্পোজিটার হয়। প্রেসের কাজ তাকে পেয়ে বসল ভূতের মত। নেশা লেগে গেল। এখন সে একটি ছোট প্রেসের মালিক। সকাল থেকে গভীর রাত পর্য্যন্ত সে প্রেসের অফিস-ঘরে গুম হয়ে বসে থাকে, অন্ধকার ঘর, দিনের বেলাতেও আলো জ্বাল্‌তে হয়।

হরিলালকে কেউ প্রেস-বাড়ীর বাহিরে যেতে দেখে নি। যকের মত সে প্রেস আগলে ব'সে থাকে। কম্পোজিটারদের বকে, প্রেসের মুসলমান কারিগরদের সঙ্গে ঝগড়া করে, খাতার উপর ঝুঁকে হিসাব লেখে ; লাল কালি দিয়ে প্রুফের ভুল কাটে, দিশাহারা প্রেতাত্মার মত প্রেস-বাড়ীতে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। কয়েকটি জমিদার-বাড়ী ও মহাজনের ঘর তার বাঁধা আছে। খাজনার রসিদ, তেজারতি, জমিদারী কাগজ-পত্তর ইত্যাদি হাজার হাজার তাকে ছাপ্‌তে হয়, জেলা মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ডের কাজও মাঝে মাঝে পায়। সে নিজে কোথাও যায় না। দালাল দিয়ে অর্ডার আনায়, অকাতরে ঘুস দেয়। সে ত' টাকার জন্য কাজ চায় না, প্রেসে কাজ

থাক্‌লেই হ'ল, তাতে লোকসান দিতেও আপত্তি নেই। তবে গল্প-উপন্যাসের বই সে ছাপতে নেয় না। গল্প-উপন্যাসের প্রুফ পড়তে চায় না; ও-সব মেকী ভালবাসার কথা পড়্‌তে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

তবু লোকে বলে, হরিলাল ব্যর্থ-প্রেমিক!

তার শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, মলিন বেশ, অর্থেপ্সু ভাব, অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখলে কেউ ভাবতে পারে না, এ-লোক একদিন ভালবেসেছিল, প্রেমের কবিতা পড়েছিলে, ব্যর্থ হৃদয়ে উদাসী হ'য়ে চলে গেছ্‌ল।

হরিলাল ভালবাসে দিনের চেয়ে রাতে কাজ কর্‌তে। রাতে তার ভাল ঘুম হয় না। অন্ধকার-স্তব্ধ বৃহৎ বাড়ীতে একা প্রেতের মত ঘুর্‌তে চায় না। কম্পোজিটারদের টাকার লোভ দেখিয়ে ওভার-টাইমে খাটায়, ছাপ্‌বার কাজ রাতের জন্য রাখে; এজন্য মাঝে-মাঝে গভর্ণমেণ্টকে জরিমানা দিতে হয়েছে, তার জন্য সে ক্ষুণ্ণ নয়।

কিন্তু যে-রাতে হুইস্কির নেশা ভাল করে ধরে, সে রাতে সে ছাপ্‌বার যন্ত্রের ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ সহ্য কর্‌তে পারে না; চেঁচিয়ে ব'কে ছাপাখানার সবাইকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর নিজের ঘরে আলো জ্বালিয়ে ড্রেসিং-টেবিলটার সাম্‌নে ইজিচেয়ার টেনে বসে। এই ড্রেসিং-টেবিল হচ্ছে তার যৌবন-স্বপ্ন, তার প্রেম-স্মৃতির রূপক!

অনেক ঘুরে এক পুরাতন আস্‌বাবের দোকানে হরিলাল মেহগনি কাঠের এই বহুমূল্য ড্রেসিং-টেবিলটি কিনেছিল। কনকলতার ঠিক এইরকম একটা ড্রেসিং-টেবিল ছিল; ছাদের

কোণ থেকে, ঘরের জান্‌লার ফাঁক দিয়ে, পথের বাঁক থেকে সে কতদিন দেখেছে, ড্রেসিং-টেবিলের সামনে কনকলতা চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে, কিশোরী মুখের অনুপম সৌন্দর্য্য কাচের ওপর ঝক্‌মক্ কর্‌ছে, সে-দীপ্তিতে হরিলালের অন্তরে আগুন লেগে গেল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল জীবন।

রাত্রির বিনিদ্র প্রহরে প্রমত্ত রক্তনয়নে হরিলাল ড্রেসিং-টেবিলের মলিন কাচের দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে উঠে ময়লা তোয়ালে দিয়ে কাচ ঘ'সে পরিষ্কার কর্‌তে চেষ্টা করে, কাচ আরও অস্বচ্ছ হয়ে যায়, বালি-খসা দেওয়ালের ছায়া প'ড়ে। হায়, একবার কনকলতার মোহিনীরূপ ওই কাচে ভেসে ওঠে না!

গেলাসের পর গেলাস হুইস্কি পান ক'রে হরিলাল অচেতন হয়ে ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ে, ইজিচেয়ার থেকে মাথাটা শূন্যে ঝুল্‌তে থাকে। কোন কোন দিন সে মেজের উপর লুটিয়ে প'ড়ে যায়।

নিশীথে প্রেসের লোকেরা উপরতলা হ'তে একটা গোঁ-গোঁ আর্ত্তনাদ মাঝে মাঝে শুন্‌তে পায়, তারা চম্‌কে ওঠে, এ ভূতের বাড়ীতে আর রাতে কাজ কর্‌বে না ঠিক করে, আবার পয়সার লোভে পরদিন রাতেও কাজে থেকে যায়।

বারান্দায় ভুটিয়া চাকরটা কিন্তু অকাতরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

আলো-ছায়াঘন নীলাকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লীলা অপরূপ। কখনও আকাশ নীলকান্তমণির মত দীপ্ত, কখনও তরুণীর স্বপ্ন-ভরা কালোচোখের মত স্নিগ্ধ। প্রভাতের সূর্য্যালোকে কলিকাতার পথ, বাড়ী, জনস্রোতও মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব সুন্দর হয়। কোন কাজে

মন লাগে না। আকাশে, আলোকে কোন্ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর হাসি, রঙীন দিগন্তে কোন্ অপরিচিতার হাতছানি! সহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, শস্যশ্যামল নদীতীরে বা হ্রদ-শোভিত পর্ব্বত-শিখরে, ধরিত্রীর সৌন্দর্য্যলোকে।

হরিলালের প্রেসের অফিস ঘরে কিন্তু এ-আলো পৌছায় না। মলিন ঘসা-কাচের মধ্য দিয়ে বাহিরের যে আলোটুকু আসে, তাতে মন শুধু বিষণ্ণ, অবসন্ন হ'য়ে যায়।

হরিলালের জীবনে কোন সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই, সুখ-দুঃখের কথা বল্‌বার, পরামর্শ দেবার লোক নেই। আজ প্রভাতে সেজন্য সে বড় মুস্কিলে পড়েছে। অফিস-ঘরে দু'খানি চিঠি খুলে সে গুম হ'য়ে বসে। একখানি চিঠি এলাহাবাদের একটি উকিল লিখেছে, আর একখানি চিঠি লিখেছে তার ভাগ্নী।

প্রতি বছর সে তার বোনের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেত; পূজার পর বিজয়ার প্রণাম জানিয়েই তার বোন একখানি চিঠি লিখ্‌ত; সারাবছর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে চিঠি পাবার মধ্যে সেই একমাত্র চিঠি। সে বোন পাঁচ বছর হ'ল মারা গেছে, সে চিঠিও বন্ধ হয়েছে।

এলাহাবাদের উকিলটি লিখেছেন, তার ভগ্নীপতি হঠাৎ মারা গেছেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি যে উইল ক'রে যান তাতে তিনি হরিলালকে উইলের একজন এক্‌জিকিউটার এবং তাঁর ষোলবছরের মেয়ে রেবা ও সাত বছরের ছেলে নিতুর গার্জ্জেন নিযুক্ত ক'রে গেছেন। রেবা এখানে স্কুলের শিক্ষা শেষ করেছে, এখন কলিকাতায়

হরিলালের তত্ত্বাবধানে কলেজে পড়তে চায়। নিতুও তার সঙ্গে যাবে, ও স্কুলে পড়বে।

রেবা অন্য আর একটি খামে চিঠি লিখেছে। পিতার মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস বিশেষ নেই। লিখেছে, নিতু ও সে শীগ্‌গির কলিকাতায় যাচ্ছে। মামাবাবু যেন নিতুর জন্য ভাল স্কুল দেখে রাখেন। সে কোন বোর্ডিং-এ থেকে পড়া-শোনা করতে পারত কিন্তু তা'হলে নিতু কোথায় থাকবে? সেজন্য মামাবাবুর সঙ্গেই তাদের থাকতে হবে, মামাবাবু যেন সেই রকম ব্যবস্থা করেন।

চিঠি দু'খানা হরিলাল দু'বার পড়লে। না, তাদের এখানে থাকা চলবে না। ওই থাকোহরির মেসে না-হয় থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। সরকারবাবুর সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করবে ভাবলে। সরকারবাবুকে ডেকে পাঠালে, কিন্তু চিঠি-সম্বন্ধে কোন কথা বল্লে না। 'বিল" সব আদায় হচ্ছে না কেন, ব'লে বকলে। উঠে কম্পোজিটারদের গালাগাল দিয়ে এল। তারপর চিঠি দু'খানা হাতে ক'রে দোতলার ঘরে গিয়ে গুম হ'য়ে বসল।

কাকে সে পরামর্শ জিজ্ঞেস করবে? আর প্রেসের লোকেরা তাকে ভয় করে, খানিকটা ঘৃণাও করে। আর সরকারবাবু, দালালরা তাকে সুবিধামত খোসামোদ করে।

হরিলালের চিঠির উত্তরের অপেক্ষা না করেই রেবা নিতুকে নিয়ে চ'লে এল। একদিন সকালে একটি ট্যাক্সি এসে প্রেস-বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। রেবা নিতুকে নিয়ে নামল। সঙ্গে জিনিষপত্তর

বেশী নয়, দু'টো বড় টিনের ট্রাঙ্ক, দু'টো বইয়ের বাক্স ও বিছানা। অ-দরকারী সব জিনিষ তারা এলাহাবাদে বিক্রি ক'রে এসেছে।

পায়ে লাল-চামড়ার হিল-তোলা জুতো, সবুজ পাড় মাধবী রং-এর শাড়ী ঘুরিয়ে পরা, চোখে কাচকড়ার চশ্‌মা, হাতে চামড়ার ব্যাগ ঝুল্‌ছে। রেবা অতি সপ্রতিভ, স্মার্ট, কন্‌ভেণ্টে-পড়া মেয়ে, তার সঙ্গে হাফ্‌-প্যাণ্ট-পরা নিতু, গলা-খোলা সার্ট, হাতে বেতের ছোট ছড়ি।

হরিলাল গ্যালি-প্রুফ হাতে বার হতেই তাকে তারা প্রণাম করলে।

—চ'লে এলুম মামাবাবু। আর এলাহাবাদ ভাল লাগছিল না। আমাদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন?

—আচ্ছা, আচ্ছা, ও রে, উপরে নিয়ে যা এঁদের। কি দরওয়ান, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন?

হরিলাল প্রুফ হাতে তার অফিসে ঢুক্‌ল। দোতলায় দু'খানা ঘর পরিষ্কার ক'রে রাখা হয়েছিল। দরওয়ান ও ভুটিয়া চাকর জিনিষপত্তরগুলো সেখানে টেনে তুল্‌লে।

বাড়ী ও ব্যবস্থা দেখে রেবা কিছুই দমলে না। দমবার মেয়ে সে নয়। মা মারা যাবার পর তাকেই সংসার দেখতে হ'ত। তা'ছাড়া কলিকাতায় আসার কৌতুকে, উৎসাহে, আনন্দে তার মন ভরপূর। যৌবন-স্বপ্ন তার চোখে। সে-স্বপ্নের ঘোরে ভাঙা বাড়ীও রাজপ্রাসাদ।

সাত দিনের মধ্যেই রেবা সব গুছিয়ে নিলে। নিতুকে পাড়ার স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলে, নিজে কলেজে ভর্ত্তি হবার ব্যবস্থা করলে, মেয়েদের কলেজে নয়, ছেলেদের কলেজে। এক ব্যাঙ্কে নিজের নামে এ্যাকাউণ্ট খুললে। দোতলার ঘরগুলো সাফ্ করে বাসযোগ্য ক'রে তুললে।

সরকারবাবু এসে বললেন, দিদিমণি, আপনার যখন যা টাকা দরকার হবে, আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন, বাবু বলে দিলেন। এখন এই ত্রিশটা টাকা রাখুন। নিতুর স্কুলের মাইনে—

—সে আমি দিয়েছি, সরকারমশাই। বাবা যা রেখে গেছেন তাতে আমাদের লেখাপড়ার খরচ লাগবে না।

—আপনি ত' সংসারের ভার নিলেন—সংসারের খরচ—

—আচ্ছা টাকাগুলো রেখে যান টেবিলের উপর।

দরোয়ান দিনে চারবার সেলাম ক'রে দাঁড়ায়—দিদিমণি কিছু কাজ আছে?

ভুটিয়া চাকরটা অকারণে হাসে। ধীরে তাকে বাবুর্চ্চি ক'রে তোলবার আশা রেবা একেবারে ত্যাগ করে না।

কিন্তু হরিলালের দেখা পাওয়া যায় না। সারাদিন সে থাকে আফিস-ঘরে ও প্রেসে। রাতে নিজের ঘরে প্রবেশ ক'রেই দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

রেবা মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আফিস-ঘরে দেখা করতে যায়। হরিলাল চমকে চায়, কথা কয় না, কিছুক্ষণ পরে বলে, এখানে না, এখানে না, এখান থেকে যাও।

--মামাবাবু, সারাদিন এ অফিসের অন্ধকূপে থাক্‌লে শরীর থাক্‌বে কেন ? চল, বেড়িয়ে আসি, সুন্দর সন্ধ্যেবেলা।

—না, আমার অনেক কাজ, প্রুফের তাড়া দেখ্‌ছ! এ-সব কম্পজিটরগুলো বদমাইস, সয়তান, সরেছি কি ফাঁকি দেবে, টাইপ চুরি করবে! এই ক'রে আমার বিশ বছর কাটল।

রেবা চ'লে আসে। লাল চামড়ার হিল-উঁচু জুতোর শব্দ মেঝেতে, সিঁড়িতে খট্‌খট্‌ বাজে। হরিলাল কাজ কর্‌তে পারে না, অফিস-ঘর হতেও বার হ'তে পারে না। ভাবে, কনকলতার এই রকম চোখের চাহনি, এই রকম গলার স্বর ছিল বুঝি! কিছু মনে পড়ে না।

নিতুর সঙ্গে কিন্তু হরিলাল পেরে ওঠে না। সে প্রাণের খুসিতে ভরা দুর্দ্দান্ত ছেলে। শাসন জানে না, বারণ মানে না। একমাত্র দিদির কথা শোনে।

—মামাবাবু, আমার নাম ছাপিয়ে দাও, বইতে কেটে মারব।

—মামাবাবু, আমি কম্পোজ কর্‌তে শিখব।

—মামাবাবু, আজ বড় ফুটবল ম্যাচ, আমায় নিয়ে যেতে হবে। দিদি যেতে চায় না।

হরিলাল তার কোন প্রার্থনা শোনে না, কিন্তু প্রেসের লোকেরা লুকিয়ে তার নাম ছেপে দেয়, দিদির নামও। সরকারবাবু লুকিয়ে তাকে ম্যাচ দেখিয়ে নিয়ে আসেণ

দিন দিন হরিলালের অন্তর অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। এতদিন তার মন ছিল স্থির, পচা ডোবার বদ্ধ জলের মত, অশান্তির অনুভূতি ছিল না।

এখন দিনের বেলায় কাজে মন লাগে না, প্রুফে অনেক ভুল থেকে যায়। রাতে মদ খেয়ে অচৈতন্য হ'য়ে না পড়্‌লে ঘুম আসে না।

এই পুরাতন-বাড়ীতে নানা অপরিচিত শব্দে তাকে দিশাহারা করে। প্রেসের ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দের সঙ্গে লালচামড়ার জুতোর হিলের খট্‌খট্‌ শব্দ বাজে, উচ্ছ্বসিত হাসির ধ্বনি আসে, কারা গল্প কর্‌ছে, তাদের উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠের শব্দ শোনা যায়।

একদিন সন্ধ্যায় হরিলাল শুন্‌ল, ওপরে গ্রামোফোন বাজ্‌ছে, গ্রামোফনের গানের সঙ্গে রেবা ও নিতু গলা মিলিয়ে গান গাইছে। অসহ্য! এরা লেখাপড়া করে না, গান-বাজনা করে! ইচ্ছা হ'ল, ছুটে গিয়ে খানিকটা বকুনি দিয়ে আসে। শেষে বকুনিটা ছাপাখানার লোকদের ওপর হয়। শুধু সে সরকারবাবুকে ডেকে বল্‌লে—ওপরে ব'লে আয়, বাবুর মাথা ধরেছে, গ্রামোফন বন্ধ কর্‌তে।

সে-রাতে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার সম্মুখে হরিলাল বহুক্ষণ তৃষিত নয়নে চেয়ে রইল—কনকলতা! তুমি উদিতা হও, তোমার অপরূপ মূর্ত্তি একবার কি ওই আয়নাতে ভেসে ওঠে না!

একদিন বিকেলে হরিলাল অফিস-ঘর থেকে দেখ্‌লে, রেবার সঙ্গে একটি তরুণ যুবক গেট দিয়ে প্রবেশ কর্‌ল; তারা হাসতে

হাসতে পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। রেবার মুখে কি অনুপম লাবণ্য, যুবকের মুখে কি অপূর্ব্ব দীপ্তি !

না, এসব বেহায়াপানা চল্‌বে না। এরা পড়া শোনা করে, না খেলা করে ?

মাধবী রং-এর শাড়ী প'রে জুতোর হিলে সিঁড়িতে খট্‌খট ক'রে রেবা চ'লে গেল যুবকটির সঙ্গে বেড়াতে। হরিলালের ইচ্ছা হ'ল, ছুটে গিয়ে সে রেবাকে বকুনি দেয়। চেয়ারে গুম হ'য়ে বসে রইল।

সে-রাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্‌ল। কপাল কেটে গেল। ডাক্তার এসে বল্লে, ব্লাডপ্রেসার, অত্যধিক চিন্তা ও অপরিমিত মদ্যপানের ফল। মদ খাওয়া চল্‌বে না।

পরদিন সন্ধ্যায় হরিলাল যখন ঘরে গেল, দেখলে তার হুইস্কির বোতল নেই। ভুটিয়া চাকরকে ডেকে চেঁচিয়ে বাড়ী মাৎ কর্‌লে।

রেবা ছুটে এসে বল্‌লে, মামাবাবু ডাক্তার ত' খেতে বারণ ক'রে গেছে। আমি সরিয়ে রাখতে বলেছি।

—তুমি ! তুমি ! কে তুমি ! আমি তোমার গার্জ্জেন, না তুমি আমার গার্জ্জেন ? আমার ওপর গার্জ্জেন-গিরি ফলাতে এসেছেন ! ওসব বেল্লিকপনা আমার বাড়ীতে চল্‌বে না।

স্তম্ভিত হয়ে রেবা চ'লে গেল। ভুটিয়া চাকর দু'বোতল হুইস্কি আন্‌তে ছুট্‌ল।

সে-রাতে ঘরে আয়নার সাম্‌নে হরিলাল অনেক্ষণ কাঁদ্‌লে। বহুযুগ পরে কাঁদ্‌লে। কবে যে সে কেঁদেছিল, মনে পড়্‌ল না। কেঁদে তার মন হাল্কা হ'ল।

শুধু সহপাঠী নয়, সহপাঠিনীরাও প্রায়ই রেবার সঙ্গে কলেজের পর বিকেলে আসে, সিঁড়ি দিয়ে চঞ্চলপদে উঠে যায়, নানারঙের শাড়ীর ঝলমলানি। হরিলালের পাশের ঘরে তারা গল্প করে, হাসে, গান গায়, গ্রামোফোন বাজায়, সমস্ত বাড়ী সচকিত পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে। ভাঙা দরজাটা উই-খাওয়া জানালাকে বলে, কোন্ মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দর বল দেখি? জানালা উত্তর দেয়, দেখ্‌তে সুন্দর আমি বুঝি না, আমি চাই প্রাণ-ভরা মেয়ে, সে হচ্ছে রেবা। নাচ-ঘরের দেওয়ালগুলো বহু বৎসর পরে গীত শুনে উল্লসিত হ'য়ে বলে, ওরা যদি নাচত, আরও ভাল হ'ত। সিমেণ্ট-ওঠা মেঝে বলে ওঠে, আমাকে কেন লজ্জা দেওয়া, এ ভাঙা মেঝেতে কি নাচ হয়?

সেতার বাজানর সঙ্গে মাঝে মাঝে গীতা ইরা-রা নাচে, সাগর নৃত্য, যমুনা-নৃত্য, গরবা-নৃত্য।

হরিলালের মনে হয়, সে হয় ত উন্মাদ হ'য়ে যাবে। মাথায় মাঝে মাঝে অসহনীয় ব্যথা হয়, বুকের ভেতরটা জ্বলে।

এখন সে মাঝে মাঝে দরওয়ান বা সরকারবাবুকে নিয়ে প্রেসের অর্ডার আন্‌তে বাহিরে যায়। পথের ট্রাম, মোটর-গাড়ীর ধ্বনিতে জন-কোলাহলে আপনাকে ভুল্‌তে চায়। জমিদারদের বাড়ী থেকে বেশী কাজ আর আসে না, বাহিরে নতুন কাজ সন্ধান করাও দরকার।

সেদিন দুপুরে সে সরকারবাবুকে নিয়ে হাওড়াতে এক অর্ডারের যোগাড়ে গেল। কি এক পর্ব্বোপলক্ষে প্রেস ছুটি ছিল। বোটানি-

ক্যাল বাগানের কাছেই বাড়ী, সরকার-বাবুর নির্দ্দেশমত ষ্টীমার ক'রে গেল। বহুদিন পরে গঙ্গা দেখে বড় ভাল লাগ্‌ল।

বোটানিক্যাল বাগানে নেমে সে বললে, আসুন সরকারবাবু, একটু বেড়িয়ে যাওয়া যাক্। সুন্দর বাগান ত'। সেই একবার ছেলেবেলায় এসেছিলুম।

ঘুরতে ঘুরতে সহসা সে চম্‌কে উঠল। এক তালকুঞ্জের পাশে সবুজ নরম ঘাসের উপর এক তরুণ ও তরুণী ব'সে। তারা ডালমুট না কি খাচ্ছে আর গল্প করছে। হাঁ, ও-ই ত' রেবা! রেবা পরেছে ঘন নীল শাড়ী, শরৎ আকাশের মত নীল, মাথায় কি লালফুল গোঁজা, তার মুখে মায়া, চোখে বিদ্যুৎ! তার পাশে সাদা পাঞ্জাবী-পরা যে ছেলেটি ব'সে, তাকে হরিলাল প্রায়ই রেবার সঙ্গে আস্‌তে দেখেছে।

অসহ্য! এরা কলেজে না গিয়ে এখানে এসে হাসি-গল্প করে! সেদিন যে ছুটি হরিলালের খেয়াল ছিল না।

সে রেবার অভিভাবক, সে এবার তার দায়িত্বের, কর্ত্তৃত্বের পরিচয় দেবে। লাঠি হাতে হরিলাল ছুটে গেল কুঞ্জের দিকে, সহসা তার মাথা ঘুরে গেল। সরকারবাবু ধ'রে না ফেল্‌লে সে রাস্তায় প'ড়ে যেত।

রেবাকে শাসন করা হ'ল না। সরকারবাবু তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে গেল, মাথায়, চোখে-মুখে জল দিলে।

শরতের স্বচ্ছনীল আকাশ ক্ষণিক অন্ধকার ক'রে এক পশ্‌লা বৃষ্টি এল।

সে-রাত্রে হরিলাল হুইস্কির বোতলের সাম্‌নে ইজিচেয়ারে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পার্‌ল না। ঘরে অস্থিরভাবে ঘুরতে লাগ্‌ল,

খাঁচায়-পোরা বাঘের মত। মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তাড়িয়ে দেব, ছেলেটাকে মেরে তাড়াব, আর ওকে এবার মেয়ে-কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দেব, গাড়ীতে যাবে-আস্‌বে, কোথাও যেতে পারবে না, কেউ আস্‌তে পারবে না, আমি ওর গার্জ্জেন। আমার দায়িত্ব। তাড়িয়ে দেব মেরে।

ভাঙা দরজাটা উই-খাওয়া জানালাকে বললে, এ বলে কি! সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না-কি?

সিলিং-এর মোটা হুকটা শিউরে উঠ্‌ল—না, না, না।

বালি-খসা দেওয়াল কেঁপে বললে, এ হ'তে দেওয়া হবে না, তার আগে আমি ওর ঘাড়ে ভেঙে পড়ব।

খড়্‌খড়ি-ভাঙ্গা জানালা মৃদু দুলে ব'লে উঠল্‌, সে বেশ হবে।

ঘরে ঘুরতে ঘুরতে হরিলাল চম্‌কে দাঁড়াল। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে এ বৃহৎ আয়না ত তার চোখে কোনদিন পড়ে নি। খুব বড় আয়না, সরকারদের আমলের; তার গিল্‌টি-করা ফ্রেম কালো হয়ে গেছে, কাচও অস্বচ্ছ, কোণে কোণে মাকড়সা জাল তৈরী করেছে।

সে আয়নায় এক ক্রূর-কর্ম্মার মুখ ভেসে উঠ্‌ল, খাঁড়ার মত নাক, জ্বলজ্বলে চোখ, লম্বা-সরু দাড়ি, লোকটা 'পাকা পরামর্শদাতা। সে হরিলালের কানে কানে বল্‌লে, ঠিক, মেয়েটা কি গোল্লায় যাবে, আজকাল এসব হচ্ছে কি! তুমি অভিভাবক। পর্দ্দা আর শাসন চাই।

হরিলাল মনে জোর পেল, আরও খানিকটা হুইস্কি খেল। শাসন করতে হবে, চুলের মুঠি ধ'রে চাবুক মারলে তবে গায়ের জ্বালা যায়। হাতে লাঠি তুলে নিলে।

খড়খড়ি-ভাঙ্গা জানালা ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌ল, এ কি, সরকারদের

মেজবাবুর গলা, আবার তের বছর পরে শোনা যাচ্ছে! আবার একটা নারী-নির্যাতন, আত্মহত্যা হবে না-কি!

সিলিং-এর বড় হুক কেঁপে ব'লে উঠ্‌ল, আমার গায়ে দড়ি লাগিয়ে ঝুলে আর কেউ মরতে পারছে না। দড়ি বেঁধে একটু টান দিলেই আমি খ'সে পড়ব।

পুরাতন ঘড়ি টক্‌টক্ ক'রে বল্‌লে, কিন্তু সুরবালা যে রাতে তোমার গায়ে দড়ি বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে মরেছিল, তখন ত' খ'সে পড়তে পার নি!

হুক নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, তখন আমি শক্ত ছিলুম, সরকার-বাড়ীর ঝাড়-লণ্ঠন আমি ধ'রে ঝুলিয়ে রাখতুম; সরকার-কর্ত্তাদের মনের মতনই অটল দৃঢ় ছিলুম।

দেওয়াল বালি খসিয়ে বল্‌লে, কিছু করতে হবে না, আমি ঘাড়ে ভেঙে পড়ব।

নারী-শাসনের জন্য হরিলাল তৈরী। বড় পুরানো আয়নার সামনে আবার দাঁড়াল। সে-লোকটা কানে কানে বল্‌লে, যাও বকুনি নয়, মার দিয়ে এসো, একটা চাবুক নেই? চাবুক চাই? দেখ, ওই কোণে রয়েছে।

আয়নার নীচে মেঝের ধূলোর মধ্যে হরিলাল একটা চাবুক খুঁজে পেলে। রূপো-বাঁধানো হাতল, চাবুকটা কালো সাপের মত।

সশব্দে শূন্য ঘরের ভাঙা মেঝেতে চাবুক মেরে হরিলাল লাফিয়ে উঠ্‌ল। আয়নার লোকটির মুখে ক্রূর হাসি। বাতাসে হরিলাল চাবুকের শব্দ করল।

চাবুক হাতে হরিলাল প্রস্তুত। আয়নার লোকটি বল্‌লে, যাও, দেরী ক'রো না দরজা হয়ত বন্ধ ক'রে দেবে।

সমস্ত ঘর শিউরে উঠ্‌ল। মেজে কেঁপে দুলে উঠ্‌ল, হরিলালের যেন মাথা ঘুর্‌ছে।

স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে আয়নার দিকে চাইল। তার চোখ জ্বল্‌ছে, হাত কাঁপ্‌ছে।

এ কি! এ কার মুখ আয়নায় ভেসে উঠ্‌ছে। এ স্বপ্ন না সত্য!

হরিলাল দেখ্‌লে তার চিরজীবনের ঈপ্সিত কনকলতার মুখ, কিন্তু সে-মুখে মায়াময় সৌন্দর্য্য নেই, দু'চোখে কি করুণতা, সমস্ত মুখে কি গভীর বিষণ্নতা!

হরিলালের হাত থেকে চাবুক প'ড়ে গেল। উন্মত্তের মত সে আয়নার দিকে ছুটে গেল—কনকলতা! তোমার চোখে জল কেন, কনকলতা?

হরিলাল তার বুকে অসহনীয় বেদনা অনুভব কর্‌লে, হৃৎপিণ্ড বুঝি ছিন্ন স্তব্ধ হ'য়ে যেতে চায়।

দেওয়াল কেঁপে উঠ্‌ল। সরকারদের বৃহৎ প্রাচীন আয়না ফেটে ঝন্‌ঝন্ ক'রে ভেঙে প'ড়ল।

ভাঙা আয়নার টুক্‌রার ওপর মেঝের ধূলোভরা গর্ভে হরিলাল মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ল।

সমস্ত বাড়ী শিউরে উঠ্‌ল। নীচে ছাপবার কল ঘুর্‌ছিল, একটা ইস্ক্রুপ ভেঙে ছিট্‌কে পড়ল, কল অচল, নীরব হ'ল।

রেবা দরোয়ানকে দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে পাঠালে। দেড়ঘণ্টা পরে ডাক্তার এসে হরিলালের মৃত্যু-সার্টিফিকেট লিখে চ'লে গেলেন।